উৎসর্গ

বইখানি স্নেহের অসীম ও উমা বৌমার হাতে দিলাম।

"মেজোকাকা"

॥ এক ॥

ঝড়, বৃষ্টি, অশনিপাত, একটা খণ্ড প্রলয়ই হয়ে গেল কাল রাত্রে। কত বাড়ির টিনের চালা উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বাজ পড়ে দাঁয়েদের বাগানের জোড়া তালগাছ দুটো আধাআধি পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘর চাপা পড়ে গরু বাছুর, ছাগল যে কত মারা গেছে তার এখনও হিসাব হয় নি। আর, অন্তত দুটো মানুষ, নিধু মালাকারের বুড়ি পিসি আর বিধবা ভাইঝি। চাপা যে দুজনেই পড়েছে তার নিশানা রয়েছে। বুড়ির লাসটা রয়েছেই পড়ে, কয়েক জায়গায় শেয়ালে খাবলানো তবে আশ্চর্য ব্যাপার, ভাইঝির লাসটাকেই পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও এক জায়গায় তার ছেঁড়া শাড়ীর খানিকটা, কাঁচের ভাঙা চুড়ি আর রক্তের দাগ দেখে বেশ বোঝা যায়, মালাকারের বাড়িটা যেমন-ভাবে ভেঙে পড়েছে, তাতে সে রেহাই পেতে পারে না।

আসলে খুব বেশী আশ্চর্য না-ও হতে পারে ; গ্রামের পূবে নদীর ধারে ধারে যে মাইল খানেকের টানা জঙ্গলটা গেছে, দিনমানে ভাল করে খোঁজ করলে, হয়তো গরু-বাছুর-ছাগলের ভুক্তাবশেষের সঙ্গে মেয়েটারও কিছু কিছু পাওয়া যাবে। আপাতত কিন্তু সবার এই বিশ্বাসই পুষ্ট করছে যে, গ্রামের ওপর দিয়ে একটা ভুতুড়ে কাণ্ডই হয়ে গেল। একান্ত অশরীরীদের অর্থে, ঠাকুর মশাইয়ের ক্ষিতি অপ-তেজ আদি পঞ্চভূত-এর অর্থ নয়। গ্রামটা চাষাভুষো বাউড়ি বণিক নিয়ে বেশী। বামন-কায়েৎ নিয়ে অল্প কয়েক ঘর আছে এক দিকে, তবে তাদের শাস্ত্র খুব বেশী আমল পায় না।

আর ভূত-পেত্নীর অর্থেই যে ভুতুড়ে কাণ্ড তার প্রমাণও তো ভোর হতে না হতে পাওয়া গেল অকাট্যই।

ঝড়-বৃষ্টি এসেছিল খুব চেপেই, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে নি, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সমস্ত গ্রামটা তছনছ করে দিয়ে রাত দুটো পর্যন্ত থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটা হৈ-চৈ লেগে রইল, তারপর ক্লান্ত হয়ে সুপ্তিতে এলিয়ে পড়েছে গ্রামটা, শেষ রাত্রে বৈরাগীপাড়ার একদিকে একটা চাপা গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে

বেশ খানিকটা কলরবে দাঁড়িয়ে গেল। আতঙ্কেরই, তবে অন্য ধরনের। রঘু সামন্তর বউ থাকোমণি আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। লাসটা বের করে একটা সুজনি দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে উঠোনের মাঝখানে একটা মাদুরের ওপর চিৎ করে শোওয়ানো। লোক জড়ো হয়েছে, নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলছে।

জল্পনা-কল্পনাই চলছে, তবে কান্নাকাটি নেই তেমন কিছু। থাকোমণিদের দুজন নিয়ে সংসার নিজে আর স্বামী রঘু। নিঃসন্তান। আর হওয়ার সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল না। আত্মীয়স্বজন যারা আছে দূরে-কাছে আসে-যায়, হয়তো রইলও দু-পাঁচ দিন খেয়াল মতো, তবে কায়েমীভাবে থাকে না কেউ। এটুকুও কয়েকটা কারণে খুব কমে এসেছিল, এদিনে তো কেউ-ই ছিল না।

আপনজন কাঁদবার মধ্যে এক রঘু, তারও কোথাও দেখা নেই।

তবে, কান্না গোড়াতেই একটা উঠেছিল। 'ওগো কি হোল! কি সর্বনাশ কাণ্ড তোমরা ছাখোসে।' বলে উঠোনের দরজা খুলে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে প্রসাদী বাউড়ি আস-পাশের সবার ঘুম ভাঙায়। প্রথমেই আসে ভৈরব পান; সে রঘুদের মুনীষ, গরুবাছুর খেত-খামার দেখে, এখানেই খায় দায়, দরজার বাইরে আটচালাটায় পড়ে থাকে। একটু নেশারও অভ্যাস আছে। ভৈরব বলছে—দুর্যোগের পর বাড়ীঘর গোয়াল ভালো করে দেখে নিয়ে গিয়ে শুয়েছিল। অবশ্য বাইরে বাইরেই, দরজা ঠেলাঠেলি করে সাড়া না পেয়ে ভাবল তাহলে ঠিকই আছে নিশ্চয়, এদিকে যখন বিশেষ ক্ষতি হয় নি, শুধু দেওয়ালের বাইরে একটা আম গাছের মোটা ডাল ভেঙে উঠোনে গিয়ে পড়েছে, তাহলে ভেতরের পাকা ঘরে আর কি হবে? এই ভেবে কল্কে সেজে গোটা কয়েক টান দিয়ে 'জয় বাবা তোমার দয়া' বলে শুয়ে পড়েছে, একটু তন্দ্রাও এসেছে, প্রসাদীর বুক চাপড়ানিতে জেগে উঠে ভেতরে এসে যা দেখল তাতে নেশাটুকু ছুটে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। শোওয়ার ঘরে কড়িকাঠের একটা দড়িতে বৌ-গিন্নির লাসটা ঝুলছে, আর সে যা দৃশ্য! চেয়ে দেখা যায় না। প্রসাদীকে বলল—'আগে শীগগির বঁটিটা নিয়ে এসো, নামিয়ে ফেলতে হবে এখনও যদি থাকে কিছু। দড়ি কেটে দুজনে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেলল, কিন্তু তখন আর কিছুই নেই, মনে হয় যেন ঝড়ের আগেই সব শেষ করে বেরিয়ে গেছে বৌগিন্নির প্রাণটা। তাই গেছে নিশ্চয়। ভুতুড়ে কাণ্ডের আরও প্রমাণ পেয়ে সমর্থন করল কয়েকজন। অপঘাতে মৃত্যু, তা

চাপা পড়েই হোক বা আত্মঘাতী হয়েই হোক ; মহাপ্রাণী বেরিয়ে গিয়েই এই রকম একটা অনাচার ঘটাতে চাইবেই। এই রকমই হয়ে আসছে বরাবর। ওঝার শাস্ত্রে তাই বলে। এই রকম পাইকিরি হারে মরায় অনেক জুটিও পেয়ে যায় তো।

লোক বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে আলোচনা অভিমতের নানা রকম ফিকড়ি বেরুচ্ছে। দেখল যে—হ্যাঁ, নিজের চোখে বৈকি। একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই খ্যাখে সাদা কাপড় পরা কে যেন দেখা দিয়েই বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ভূতের গল্প অল্পেই জমাট বাঁধে, একজন সাক্ষীও দিল—দেখল যেন একটা লাস ঘাড়ে করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে যেতে যেতে আবার তখনই মিলিয়ে গেল—যাত্রায় মহাদেব যেমন করে সতীর দেহ ঘাড়ে ফেলে নিয়ে যায়। চুলটা এলিয়ে পড়েছে···

মেয়েটা বেঁচে পালিয়েও যেতে পারে বলে যে দু-একজন অভিমত দিতে গেল, টিটকারি খেয়ে থেমে গেল—যা একেবারে প্রত্যক্ষই তাতে অবিশ্বাস দেখিয়ে বাহাদুরী নেবার জন্যে।

সামনে টাটকা লাস, ভূতের গল্প শাখা-প্রশাখায় বিস্তার হয়ে চলল।

অন্য ধরনের কৌতূহলীরও অভাব নেই। দু-একজন একটু ঢাকা খুলে দেখাতেও চাইল—দু-তিনটে নাম করা ডানপিটে ছেলে, আর গোকুল বৈরাগীর বুড়ি পিসি, তার ভূত-প্রেত নিয়ে কারবারে একটু বদনামও আছে গাঁয়ে। প্রসাদী মাথার কাছেই বসেছিল, সুজনিটা তাড়াতাড়ি টেনে মাথা-মুখে চারিদিকে আরও ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে বলল—রক্ষে কর। তোমাদের কি, যারা দুজন দেখলুম—তখনই তাড়াতাড়ি ঢেকেও দিই, কিন্তু তারই মধ্যে যেটুকু দেখলুম, তাতেই জন্মের মত ঘুম ছুটে গেছে।

ওই যা একটু কুনকুন করে চাপা স্বরে কাঁদছিল, আর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল, লাসটার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে মাথা গুঁজে পড়ে একটু স্পষ্ট করেই কান্নার স্বরে বলে উঠল—'এ কি করলি, মা। যা-ও একটু ছিল তা-ও একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে গেলি!'

॥ দুই ॥

মাতব্বরেরাও একে একে এসেছে, জল্পনা-কল্পনার ভাগ কমে গিয়ে আলোচনা অন্য দিকে ঘুরল, এখন লাস নিয়ে করা হবে কি ?• আর, রঘু কোথায় ? তাকে যে দেখা যাচ্ছে না।

রঘুর খোঁজ এসেই করা গিয়েছিল, জড়াজড়ি করে জানাল কয়েকজনে। প্রসাদী বলেছে রঘু কালও সকালে খানিকটা গলাবাজি করে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, যেমন আজকাল প্রায় নিত্যই করছে, কাল ছিল আবার বাড়াবাড়ি। তারপর আর তার চেহারা দেখা যায় নি। বাড়াবাড়ি ছিল তা পাশের বাড়ির কয়েকজনও বলল। জানা গেল তার খোঁজে কয়েকজন গেছে—ফেরে নি সবাই এখনও। হয়তো খোঁজ করে এসে বলবে, সেও গাছচাপা পড়ে অপঘাতে মরে পড়ে আছে কোথাও—এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করল অনেকে। মাতব্বরেরা আসতে প্রসাদী আধঘোমটা টেনে বসেছিল, মাঝে মাঝে থাকোমণির বুকের উপর চাপড় দিয়ে চাপা স্বরে কেঁদেও উঠছিল, চাপা স্বরেই জানাল, ভৈরবকে নদী পেরিয়ে বাঘআঁচড়ায় পাঠানো হয়েছে। সাঁটে জানাল সেইখানেই তো আজকাল যায় বেশী, থাকেও সেইখানে দিনের দিনের পর দিন···'সেই অভিমানেই তো মা আমার এমন করে···' বলে বুকের উপর আবার লুটিয়ে পড়ল।

কয়েকজন বর্ষীয়সীও পাশে এসে বসেছে, সান্ত্বনা দিতে লাগল---কাঁদলে কি ফিরে আসবে আর ?

লাসটা দাহ করে ফেলবার কথাই বলল অনেকে, আর থানা-পুলিসের হাঙ্গামা না করে, অযথা সাক্ষী-সাবুদের ফ্যাসাদে পড়ে যাওয়া। আজ একটা সুবিধা, পুলিশের কানে যদি যায়ই কোন রকমে তো বললেই হবে চাপা পড়ে মরেছিল, দাহ করে দেওয়া হয়েছে। নিধু মালাকারের পিসি আর বিধবা ভাইঝিটা পড়েছেই চাপা, দিন এগুলে আরও এমনি কত খবর পাওয়া যাবে। তাদের সঙ্গে থাকোমণিকেও মিশিয়ে দেওয়া যাবে। ঘর ভেঙে পড়ে নি, তেমনি পাঁচিলের বাইরের আমগাছের মোটা ডালটা ভেঙে উঠোনের এক ধারে এসে পড়েছে, বেশ চালিয়ে দেওয়া যাবে। থানা প্রায় পাঁচ মাইল দূরে।

এসব খবর দেওয়া চৌকিদারের এলাকা, সে চেপে গেলেই একটা হাঙ্গামা মিটে যায়। পেয়াদা পুলিশ গ্রামে না ঢুকলেই ভালো। তদন্ত ছেড়ে আগে পুকুরের মাছ, বাগানের তরিতরকারী, গাছের ফলের উপর নজর, রঘুর কাছাকাছি প্রতিবেশীরা দাহ করে ফেলবার উপরই জোর দিল বেশী করে। দরকার হয় চৌকিদারকে কিছু দিয়েথুয়ে ঠাণ্ডা করা সহজ হবে। গ্রামের চৌকিদার রহমৎ শেখ, তার বাড়ি গ্রামের অপর প্রান্তে, লোক ছুটিয়ে দেওয়া হল।

প্রসাদীর একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। আশ্চর্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এমন আশ্চর্যের কিছু নয়। সমস্ত রাত দুর্যোগের জন্য ঘুম নেই, তার পরেই এই অভাবিত ব্যাপার, উদ্বেগে ক্লান্তিতে শরীরটা একেবারে এলিয়ে পড়েছিল, মাঝে মাঝে শোকের উচ্ছ্বাসে যে শবের বুকে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছিল চাপা কান্নার সঙ্গে, একবার সেটা একটু বিলম্বিত হয়ে বুঁজেই এসেছিল চোখ, হঠাৎ দাহ করা-না-করার তর্কের মধ্যে জেগে উঠে একটু সাড় হতেই একেবারে প্রবল আপত্তি তুলল—না, দাহ কোনও মতেই করা হবে না। আর থানায় খবর দেওয়াও না, তারা কখন আসবে তাদের মর্জিমাফিক, ততক্ষণ এই মড়া আগলে বসে থাকতে পারবে না সে। ওরা ময়না করবেই—গলায় দড়ির লাস, টাটকা থাকতে থানায় পৌঁছে দিতে হবে, সাধুখাঁর স্ত্রীর বেলায় তাই করা হয়েছিল। শহরে হাসপাতালে তারা লাস পাঠাবে, বেশী দেরী হলে লাস ঠিক থাকেও না। ওদের বললে ওরা সেখানে লাস দাহ করবারও ব্যবস্থা করে দেয়। এখানে দাহ করে ফেলায় প্রবল আপত্তি জানাল। আর সব কথা ছেড়ে দিলেও খবরটা বেরিয়ে পড়বেই, তখন তারা দুজনে কি জেল খেটে মরবে? যারা করবে দাহ তারাও কি বাকী থাকবে?

ভৈরব ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে জানাল রঘু বাঘ-আঁচড়ায় নেহ যায়নিই সেখানে। লাস সম্বন্ধে তারও ঐ মত। রঘু যখন নেই তখন লাস যত তাড়াতাড়ি থানায় পৌঁছে দেওয়া যায় ততই ভালো। তোড়জোড়ে লেগে গেল। কিছুক্ষণ পরে চৌকিদার রহমৎ শেখও এসে পড়ল। রঘুদেরই একটা ছৈওলা গরুর গাড়ী করে থকোমণির লাস থানায় চালান করে দেওয়া হল। রহমৎ ছাড়া সঙ্গে গেল ভৈরব। প্রসাদী উঠানে আছড়ে পড়ল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে।

রঘু সামন্তর অবস্থা বেশ ভালো। বাপ হলধর সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় শেষ বয়সে বেশ বড় জোতদার হয়ে বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গে কাটিয়ে যায়। তবে পারিবারিক বিষয়ে বেশ সুখী ছিল না। দরিদ্র বাপ-মায়ের সন্তান, তারা সময়ে বিয়ে দিতে পারে নি। বাপ মারা যাওয়ার পরে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা এলে যখন বিবাহ করল তখন বেশ খানিকটা বয়স হয়ে গেছে হলধরের। এর উপর, সন্তানও হোল যখন সে প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ সীমানায়। ঐ রঘু, আর হোলও না কোনও সন্তান।

বাপমায়ের এক সন্তান, প্রায় বুড়ো বয়সেরই সন্তান, তার উপর হলধর তখন গুছিয়েও নিয়েছে এদিকে ভালো করে, প্রচুর সম্পত্তির মালিক, খুব আদর-যত্নেই বেড়ে উঠতে লাগল রঘু।

নির্ভেজাল আদর-যত্নেরও একটা মোটামুটি বয়স বাঁধা আছে; তারপর ছেলের উপর একটু অন্যভাবে নজর দিতে হয়। সে বয়সটা এসে যখন পেরিয়েও গেল, তখন হলধর বিষয়সম্পত্তি বাড়ানো-গোছানোয় মধ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে রয়েছে; অভ্যাসবশেই আদরটা বজায় রইল, কিন্তু অন্যদিকে নজর দেওয়ার ফুরসৎ নেই। রঘু বিগড়াতে আরম্ভ করল। আদরটা প্রশ্রয়ে রূপান্তরিত হল ধীরে ধীরে। দেখেও চোখ বুজে থাকা; ও-রকম হয় বয়সকালে; আবার ঠিক হয়ে যাবে। শুভার্থীরাও সায় দিল। যারা বেশ সঙ্গতিপন্ন তাদের শুভার্থীরাও সায় দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে বলেই শুভার্থী। রঘু নেশা-ভাঙ-জুয়া—এসবে পোক্ত হয়ে তখন গ্রামের মধ্যে 'কাপ্তেন' হয়ে বেশ নাম করে নিয়েছে সুভার্থিনীদের সংখ্যাও তখন বেশ পুষ্ট। তারা রঘুর মাকে পরামর্শ দিল ছেলের বিয়ে দিতে। এসব রোগের ঐ ওষুধ, তারা ঢের দেখেছে। হলধর বিলম্বে বিবাহ করে নিজে উপকার পেয়েছে, হতে পারে সেই ধারণায় নিশ্চিন্ত ছিল। এও হতে পারে ধারণাটা নূতন করে বিচার করবার ফুরসৎ পায় নি, রাজী হয়ে গেল। রঘুর বিবাহ হয়ে গেল।

মনে হল যেন ওষুধ ধরেছে। কিন্তু সে অল্প দিনের জন্য। ওদিকে নিত্য নূতনের আকর্ষণ এত প্রবল যে বিবাহিত জীবনের মোহটা তরল, পান্‌সে হয়ে যেতে দেরি হল না। তখন আবার কাপ্তেনিতে যে ভাঁটা পড়েছিল সেটা পুষিয়ে নিতে উঠে পড়ে লাগল রঘু। হলধরের মতো অতখানি না হলেও, ওদের সমাজের পক্ষে বেশ বড় হয়েই বিবাহ হয় রঘুর, এখন তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এই সময় বউটি মারা গেল, বিয়ে হওয়ার তিনটে বছর ঘুরতে না

ঘুরতে। সন্দেহজনক মৃত্যু। কিছুদিন পর্যন্ত গ্রামে একটা কানাঘুষা লেগে রইল, আত্মহত্যা, হলধর পুলিশকে টাকা খাইয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছে। এ গুজবটা মিলিয়ে গেল এক সময়; কিন্তু একটা মুশকিল থেকেই গেল।

হলধর বার্ধক্যের সীমানায় এসে পড়েছে—স্ত্রী হরকালীও প্রায় তাই; রঘুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায়, আর বধূটিও মারা যেতে ছেলেকে সংসারে একা ফেলে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলো দুজনে। ঘটক-ঘটকিনী লাগল, কিন্তু একে ঐ ছেলে তার ওপর বধূটির মৃত্যু নিয়ে ঐ গুজব, পাত্রী পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। প্রথমে কাছের গ্রামগুলোয়, তারপরে কাছে না হওয়ার জন্যই দূরপাল্লারগুলাও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো।

রঘু এদিকে দিনকে দিন নেমেই যাচ্ছে রসাতলের দিকে। বধূর ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার পর তার জন্যও হলধরকে পুলিশের পেট ভরাতে হল বার কয়েক। বাবা আছে, নিশ্চিন্ত হয়ে গা ঢেলে দিল বদখেয়ালিতে রঘু।

এই সময়ে একদিন প্রসাদী এসে দেখা করল হলধরের সঙ্গে। মাঠের পাশে একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে জন খাটছিল, প্রসাদী হঠাৎ পেছন দিক দিয়ে এসে বলল—'শুনছি সামন্তমশাই একটি সমত্থ পাত্রীর খোঁজে রয়েছেন পাচ্ছেন না। বলেন তো আমি দিতে পারি।'

অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত, তার উপর চেহারাখানা দেখে হলধরকে কিছুক্ষণ চেয়েই থাকতে হল, মুখে রা সরল না। একেবারে সিধা, মাথায়, একটা মাঝারি গোছের পুরুষের মতোই, হাড়কাঠগুলা চওড়া, মেদহীন চোয়াল দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসায় মেদহীন হওয়া সত্ত্বেও মুখটা বড় দেখাচ্ছে। পরিধানে থান কাপড়, পায়ের গোছের খানিকটা ওপর পর্যন্ত ঢাকতে পেরেছে, বাকিটা খালি। রংটা তামাটে, ফর্সা রং বেশী রোদ বাতাসে যেমন হয়ে যায়।

হলধর একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো চিনিনে আমি।···হ্যাঁ, পাত্রী খুঁজছি বৈকি একটি ·

'আমার হাতে আছে; ভালো পাত্রী',—না চেনার কথাটা বাদ দিয়ে উত্তর করল প্রসাদী।

'কি রকম ভালো?'—একটু হতভম্ব হয়ে থাকার পর প্রশ্নটা করল হলধর; বা করতে পারল। আর একটু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমার ছেলের সঙ্গে মানাবে?'

প্রসাদী বসবার জন্যে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাত তিনেক দূর থেকে একটা

কাটা মোটা তেঁতুলের গুঁড়ি টেনে নিয়ে এসে বসল, বলল,—আপনার ছেলেই তার পাশে বেমানান, এক, বয়স ছাড়া। মেয়েটি ডাগর, বাইশ তেইশ যাচ্ছে। সুন্দরী বলতে পারা যায়।·· না, ওমন করে চাইছেন কেন? আমার মেয়ে হলে সুন্দরী বলা যেত? তাছাড়া আমি সদগোপ, মেয়েটি কায়েতের মেয়ে।'

'আমরাও তো···।'—বেশ বিস্মিত হয়েই উত্তর করল হলধর।

'সেই জন্যেই তো বলছি, ছেলে সব দিক দিয়েই মেয়ের কাছে বেমানান।'

কথাটা বলেই একটু ভালো করেই নড়ে চড়ে বসল প্রসাদী, বলে চলল—'আমার কথাগুলো শুনে যান সামন্তমশাই, তারপর যা বলবার বলবেন। মেয়ে ওপারের, মানে পকিস্তানের। কিছুদিন থেকে আমরা দুজনে এপারে এসে রয়েছি। কেন চলে এসেছি, কি বৃত্তান্ত, এখন সেসব শোনবার দরকার নেই; সাঁটে বলছি—নইলে খাঁনেদের থপ্পরে পড়ত মেয়েটা। সেসব কথা, যদি নেন মেয়েটিকে তো পরে হবে, এখন আমি যতটা দেখছি···হ্যাঁ, খোঁজ নিচ্ছি বৈকি, কোথায় ভালো একটা ঘরে গছিয়ে দিতে পারি মেয়েটাকে—তা আমি যতটা দেখছি, ছেলের আপনার তল্লাটে বিয়ে হওয়ার কোন উপায় নেই। অথচ দরকার খুবই, এত বড় বিষয়-সম্পত্তি ঐ বাউণ্ডুলে ছেলের হাতে দিয়ে মরতেও পারবেন না শান্তিতে—আর সেদিনটার বেশি দেরি নেই ··'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু···'

'কিন্তু কি,···বলুন।'

সবটাই 'কিন্তু'র ব্যাপার; এত অকস্মাৎ, এমন অদ্ভুত স্ত্রীলোকেরও মুখে প্রস্তাব, তার উপর আবার পাকিস্তানের রহস্য, কত সত্যি মিথ্যা কত রূপ ধরে নিত্যি আসছে—ঐ 'কিন্তু'টুকু বলে আরও যেন বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল হলধর।

একটু উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে থেকে প্রসাদীই কথা কইল, বলল, 'বুঝেছি হয়তো কায়েত বলে। কিন্তু কায়েত-সদগোপ এ-তো নিত্যিকার ব্যাপার আজকাল; বামুন কায়েত, বামুন-সদগোপও বাদ যাচ্ছে না। আর এটা যদি চাপা দেওয়া দরকার হয়—তো সে তো মেয়ের পক্ষেই। তা, থাকবেই চাপা, আপনি যখন চান না। অনেকের ঘরে এ দিয়ে তো আজ কাল গুমরেরই অন্ত নেই দেখছি, মেয়ে যদি উঁচু জেতের হলো।'

চেয়েই রয়েছে হলধর ফ্যাল-ফ্যাল করে। আবার প্রসাদীই আরম্ভ করল—'হয়তো বিয়েটা দেওয়া যাবে কি করে সে কথাই ভাবছেন। এখান থেকে পাঁচ

ক্রোশ দূরে আমরা মালীপুরে একটা বাড়ীতে উঠেছি—পাকিস্তানের কাছাকাছি।—আগেকার জানা-শোনা আমার সঙ্গে। নিজেদের ওপারের আত্মীয় বলে চালিয়ে দিতে রাজী আছে। তারা কায়েত বলেই মেয়ের সত্যি পরিচয়টা দিলুম, নইলে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে বাধাটা কি ছিল, বলুন না? জানি তো সেকেলের লোকেরা সেকেলের চালই ধরে থাকতে চাইবে।…ছেলেকে আপনার বিয়ের রাত্রে কায়েত বলে চালাতে হবে। ঐ একটা রাত, তার পরে ও শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে আর সম্পর্ক কি?'

সেইভাবে চেয়ে থেকে হলধর একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল—'একটু ভেবে দেখি!'

'কিচ্ছু ভাববার নেই। আমি দিন দেখিয়েই এসেছি। পরশু আমি নিজেই বাড়ীতে আসবো। ছেলে-নাপিত নিয়ে তোয়ের থাকবেন। তরশু সকালে যখন বৌ নিয়ে বাড়ী ঢুকবেন তখন কাজ হয়ে গেছে, ভাঙচি দেবার যারা—তারা বুক চাপড়াক বসে বসে। তারপর আমি রয়েছি, পেসাদী দাসী।'—লড়াইয়ের মোরগের মত একটা ঝাঁকানি দিয়ে কাঁধটা সোজা করে নিয়ে চেয়ে রইল।

'আপনিও থাকবেন এসে তাহলে?'—এত কথার মধ্যে এই কথাটুকু যেন দু হাত দিয়ে অশেষ ভরসার সঙ্গে আঁকড়ে ধরল হলধর। চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রসাদী ভ্রু দুটো একটু তুলে বলল—'ও মা আমি থাকব না? এই আপনি, গঙ্গামুখো পা, ওই আপনার ছেলে, কার ভরসায় মেয়ে আমার রেখে যাব বলুন?'

'আপনি যদি আসেন, তাহলে না হয় '

—এবার একটু গদগদ হয়েই বলল হলধর। রূঢ়, অপ্রিয়ভাষিণীর ভেতরে কিসের যেন একটা সন্ধান পেয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

প্রসাদী আর একটা ঝাঁকানি দিল কাঁধে, বলল—'তাহলে, যদি করছেনই ভরসা আমার উপর তবে একটা কথা বলে দি, কবে আছেন-না-আছেন, বলে রাখছি, আপনার ও-ছেলেকে আমি ঠিক রাস্তায় টেনে তুলবই। এখন আমার মেয়ের ভালমন্দর কথা এসে পড়ছে তো?'

॥ তিন ॥

এসব অনেক আগেকার কথা, প্রায় সাত বছর হোল প্রসাদী থাকোমণিকে নিয়ে এ বাড়ীতে এসে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

প্রসাদীর চেহারাটা পুরুষালী ছাঁচে ঢালা। এর পর দেখা গেল, কর্মশক্তিতে ও একটা সাধারণ বা একটু অসাধারণ পুরুষকেও পেছনে ফেলে যায়, তার উপর কূট বুদ্ধির সঙ্গে এ রকম নিঃসঙ্কোচ গতিবিধি ও আচরণ, কয়েক দিনের মধ্যেই হলধরের সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে নিতে ওর বাধল না। শুধু বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই নয়। হলধরের প্রচুর ক্ষেত-খামার, কয়েকটা ছোট-বড় পুকুর, আম কাঁঠালের বাগান, কাছাকাছি আবার দূরে দূরেও সমস্তরই হিসাব-পরিচয় নিল প্রসাদী ধীরে ধীরে, তারপর হলধরের অন্তরালে থেকে কাজ করতে লাগল। হলধরের বয়স হয়েছে, সারাটা জীবন অতন্দ্র খাটুনির পর দেহ মন বিশ্রাম চায়। ছেলের উপর ভরসা নেই, ঢিলে দিতে দিতে কখন যে স্থান বদল হয়েছে টেরও পেল না, প্রসাদীই সামনে, হলধর নিজে তার অন্তরালে পড়ে গেছে।

কিন্তু তাতে ওর দুঃখ নেই। একটা মানুষ প্রাণপণ করে ভেতর-বার সামলাচ্ছে। স্বার্থের মধ্যে দুবেলা দুটো খাওয়া, থাকা আর ঐ থাকোমণি। তাও থাকোমণি তো এখন ওদেরই জিনিস। আস্তে আস্তে হাত আলগা করে একে একে সমস্তই প্রসাদীর উপর ছেড়ে দিল হলধর। খানিকটা লগ্নী কারবার আছে, তার আদায়পত্র পর্যন্ত, অবশ্য খাতাপত্রের দিকটা হলধরকে সামলাতে হয়, লোকও আছে আদায়ের জন্যে তবে একটু বেয়াড়াপনা দেখলে প্রসাদী নিজেই ঠিকঠাক করে নিয়ে আসে। কয়েক ঘর প্রজাও আছে হলধরের, তাদের থেকেও আদায়পত্র। ওর কথাগুলোই ঐ ধরনের— যেমন হলধরকে প্রথম পরিচয়েই বলেছিল—অর্থাৎ অপ্রিয় হলেও সত্য, যার জন্যে যা খাঁটি সেই দিকে মনটা গিয়ে পড়ে, শ্রোতার তিক্ত লাগে না। শুধু হাঙ্গামা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি বক্তাকে সরিয়ে ফেলবার তাগিদে মনটা লেগে থাকে বেশী করে। হলধর বলে—প্রসাদ আমাদের 'নয়কে হয়' করে ছাড়বার পাত্রী। কিংবা প্রসাদ যদি আরও কটা বছর আগে আসত, তাহলে গোটা একটা জমিদারী কিনে ছাড়তাম আমি এ রকম একটা দোসর পেলে।'

থাকোমণি পিসি বলে প্রসাদীকে। সেই সুবাদে হলধরের কথা কখনও কখনও একটু ঠাট্টা-ছোঁওয়া হয়ে পড়ে। প্রসাদী বলে—'এ-ও যে পেয়েছেন এমন মনের মতন দোসর তার জন্যে সত্যনারায়ণের সিন্নি চড়ান সামন্তমশাই। ওপারে লড়াই বাধল তাই, নৈলে পেতেন কোথায় দোসরকে? মানুষটো অমন বেঘোরে মারা না গেলে...'

ওপারের রহস্যটা রেখেই গেছে প্রসাদী। তবু মাঝে মাঝে এক-আধটা কথায় হঠাৎ একটু যেন পর্দা উঠে যায়, বিশেষ করে কোন একটা বড় রকম সাফল্যের প্রশংসায় মনটা আলগা হয়ে গেলে।

একদিন নিজে ঘুরে ঘুরে ভরা এক গাড়ি নারকেল এনে বাড়িতে তুলল। সবাই জড়ো হয়েছে। সবার মুখে প্রশংসা—এক খেপে এত নারকেল কখনও এ বাড়িতে আসে নি, পাঁচ ভূতে লুটে নিয়েই যাচ্ছে।

প্রসাদী বলল -মানুষটো যখন গেল—মনিবের সম্পত্তি আগলাতেই প্রাণটা দিলে তো খানেদের হাতে—তখন তো এমন লড়াই বাধে নি। এখানে-ওখানে খান সিপাইদের ছিনতাই-রাহাজানি—তা প্রাণ থাকতে দিলে মানুষটো? সেও ছিল এই রকম ডাব-নারকেল বোঝাই গাড়ি···তা মানুষটো যেতে তো তার কাজ আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলে কত্তা, বললে···'

ঝোঁকের উপর খানিকটা বলে হঠাৎ এমনি থেমে যায়। 'মানুষটো' বলতে বোঝায় ওর স্বামী—

গত জীবনের কিছু কিছু আভাস ধরা পড়ে খণ্ডিতভাবে, সমগ্রভাবে কিছু বলে না প্রাসাদী। জোড়াতালি দিয়ে দাঁড়ায়, সেটা ছিল যেন ছোটখাট কোনও জমিদারের বাড়ি, বা হলধরের মত এই রকম জোতদারের যার জন্য এই রকম জীবনে অভ্যস্ত প্রসাদী, নূতন কথা এমন কিছু নয় ওর পক্ষে।

থাকোমণির কাছে কিছু পাওয়া যায় না। মেয়েটি শান্ত, স্বল্পবাক, একটু বিষণ্ণ; অদৃষ্টের সঙ্গে বাধ্য হয়ে রফা করতে হলে যে একটা স্রোতে গা-ঢালা ভাব এসে পড়ে, সেটা যেন সর্বদা, ওকে ঘিরে থাকে। নূতন এসে আগে খুব বেশী করেই থাকত, রঘুর জন্যে সেটা কমে আসছে। তার কারণ, হলধরকে যেমন বলে ছিল, রঘুকে পথে এনে তুলেছে প্রসাদী। অবশ্য এক দিনেই হয় নি, তবে বেশী দিনও লাগে নি। রঘুর যত কাপ্তেনি, যত বেলাল্লাপনা—তার গোড়ায় ছিল বাপ-মায়ের প্রশ্রয়, টাকার অভাবে না পড়া, বিশেষ করে মায়ের গোপন প্রশ্রয়ে। সেটা একেবারে বন্ধ করল প্রসাদী। দু-তিন দিন আড্ডায়

হানা দিতেও বাধল না ওর। ফলে ওর অপ্রিয় সত্য ভাষণের উত্তাপে আড্ডা গুলো পড়ল এলিয়ে, রঘুর বেরিয়ে আসা বা তাকে বের করে নিয়ে আসা শক্ত হল না। ওর থাকোমণিকে ভাল লেগেছে। ছেলেটা মনের দিক দিয়ে খারাপ নয়, প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আর ছেলেবেলা থেকেই তদারকের অভাবে বিগড়ে গিয়েছিল। এখন বাইরের আকর্ষণ প্রসাদীর দাপটে শিথিল হওয়ার সঙ্গে ঘরের আকর্ষণ শক্তিশালী হয়ে উঠে ওকে ফিরিয়ে আনতে লাগল ঘরমুখো করে।

এই ফিরিয়ে আনায় যার অনেকখানি হাত সেই থাকোমণির জীবনেও একটা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। ওর ওপারের জীবনটায় যাই থাক, সেটা আস্তে আস্তে মুছে গিয়ে এখানকার জীবনটা সহজ হয়ে এল। একটি সম্পন্ন গৃহস্থের পুত্রবধূ, সবই পাচ্ছে জীবনে, গোড়ায় বঞ্চিত থেকে শেষে স্বামীর সোহাগ পর্যন্ত—তার এই বয়সের জীবন যেমন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

মাঝে পাঁচ-ছয়টা বছর বেশ সুন্দর কাটল। এর পর কয়েকটা দিন একটা জটিল অসুখে ভুগে রঘুর মা মারা গেল। খুব নিরীহ, নির্লিপ্ত, নির্বিকার প্রকৃতিক মানুষ ছিল রঘুর মা। যার জন্য সে যেতে একটি জায়গা খালি হোল মাত্র, কিন্তু সংসারের কিছু ইতর বিশেষ হল না।

এর মাস কয়েক পরে হলধর একদিন হঠাৎ হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে মারা গেল। ও যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ওলট-পালট হয়ে গেল একেবারে।

॥ চার ॥

ওলট-পালট শুরু হল রঘুর জীবনের মধ্যে দিয়েই। ও সুদরে আসছিল ঠিকই, হলধর আরও কয়েকটি বছর বেঁচে থাকলে ওর ছেড়ে-যাওয়া অভ্যেসগুলো একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে সব দিক দিয়ে একজন ভাল সংসারী হয়ে উঠতে পারত। বয়সও সাহায্য করত যৌবনের বৃত্তিগুলোকে সংযত করে সুষ্ঠুভাবে বাপের রেখে-যাওয়া সম্পত্তি ভোগ করতে। এ কয় বছরে সম্পত্তির সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় যে একটা দরদ জেগে উঠছিল সেটা বেড়ে যেত। সম্ভোগ করার সঙ্গে সম্প্রসারণের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগত।

অনেক কিছুই হতে পারত, কিন্তু হলধর হঠাৎ আর নিতান্তই অপ্রত্যাশিত-ভাবে মারা যেতে এসব কিছুই হতে পারল না।

যা হল তা এসবের পরিপন্থীই।

বাপ মারা যেতে রঘুর কাছে সব চেয়ে যে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তা এই যে, এত বড় সম্পত্তিটার সে এখন একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক। এটাকে নিয়ে যা-খুশি করবার, যেভাবে খুশি ভোগ করবার অধিকার তার। এখন বলবার কেউ নেই। যাকে আগে এই সম্পত্তি নানা বাধাবিঘ্ন গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে ভোগ করতে হয়েছে, আকাঙ্ক্ষা-মতো পারেওনি, তার পক্ষে এটা যেন একটা নূতন আবিষ্কার। শেষের দিকে সে এই কটা বছর ভালোই ছিল। কিন্তু কেন যে ভাল ছিল সে খতিয়ানের দিকে মনটা গেল না। ও যে এখন মুক্ত এই অনুভূতিটাই প্রবল হয়ে উঠল। আইনের দিক থেকে মুক্ত। তার সঙ্গে আরও একটা বিপুলতর মুক্তি, প্রসাদীর প্রভাব থেকে। এদিকের এই যে সংযত জীবনের কটা বছর, যাতে সে সুখের মধ্যে—অনাস্বাদিতপূর্ব সুখের মধ্যেই কাটিয়েছে—সেটা এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ওর কাছে বঞ্চনার জীবন বলেই প্রতিভাত হয়ে উঠল।

আগেকার ইয়ারবন্ধুদের কিছু কিছু খসেছে নানা রকমে, তবে আছেও কিছু কিছু, এবং ওৎ পেতেই আছে, হাত মেলানে। প্রথমটা গোপনেই, তারপর আর গোপন রাখা প্রয়োজনই হল না। শুধু তাই নয়, যেন এতদিনের বঞ্চনা পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে এবারে আরও একধাপ নেমে গেল রঘু। এর আগে নেশা-ভাং-জুয়া, শখের যাত্রা আরও পাঁচটা ঐ ধরনের পয়সা ওড়াবার ব্যাপার নিয়ে ছিল, এর সঙ্গে জড়িত হাঙ্গাম-হুজ্জুত, এবার একটা নতুন দিকে পা বাড়াল। এবার স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। বিবাহিত জীবনের নূতন মোহটা অনেকখানি কেটেও গেছে। এখানে নয়, নদী পেরিয়ে চার মাইল ··র বাঘ-আঁচড়ায় বিধিমতো তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। এইটেই এদিকের ক-মাস ধরে ওর প্রধান আড্ডা হয়ে উঠেছে, এবং স্বভাবতই অর্থ অপব্যয়ের বাঁধানো রাজপথ। স্ত্রীলোকটার নাম ক্ষীরোদা দাসী। হলধর মারা যাওয়ার বছরখানেক পূর্ণ হতে না-হতেই রঘুর রূপান্তরটা ঘটে গেল, শুধু আরও নিগূঢ়ভাবে।

সংসারে অশান্তি দিন দিন বেড়ে চলল।

প্রসাদী পাকা মেয়ে। চাবিকাঠিটি নিজের হাতে রেখেছে। যতদিন অতটা বুঝতে পারেনি, একটু ঢিলেই দিয়েছিল, বাপ মারা গেছে, যাতে অভাবের দিকটা না বুঝতে পারে, তারপর যেমন কানে যেতে লাগল, টাকাকড়ির দিকটা টাইট করে আনতে লাগল। বিরোধ বাধল। প্রথমটা

চাপা। সামন্তবাড়ির একটা সম্ভ্রম রয়েছে, প্রসাদী এসে যেটা আরও বাড়িয়েই দিয়েছে, টাকা-পয়সা নিয়ে একটা খিটিমিটি হতে লাগল বাড়ির ভেতরেই—কেন বের করবে না টাকা? কার টাকা? নিজের টাকা যেভাবে খুশি খরচ করবে, কার বলবার অধিকার আছে? প্রসাদীর সঙ্গেই, কেননা জমা-উসুলের সব কিছুই একরকম তার একতিয়ারে, হলধরের সময় থেকেই প্রসাদী এটা আস্তে আস্তে নিজের হাতে করে নিয়েছে।

প্রসাদী পঁচিশের দাবী দশ টাকায়, পঞ্চাশের দাবী পঁচিশে মিটিয়ে চালিয়ে গেল দিনকতক; সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যেই। রঘুর পরামর্শের লোক আছে, নিজেই উসুল করল কয়েক জায়গায়—যেখানে পাওনা দশ টাকা, দুটো টাকা কম নিয়ে দশের দস্তখৎ দিয়ে। চড়া সুদে কর্জও করল। টের পেয়ে প্রসাদী বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্ধ করল এসব। শাসিয়ে, গলাবাজি করে। ওটা যেন ওর রপ্ত করাই ছিল। সামন্ত-বাড়িতে এসে নিষ্প্রয়োজনে ধার মরে গিয়েছিল। প্রয়োজনের শান পড়ে আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

ভেতরের অশান্তি বাইরে গিয়ে পড়ল, বাইরে থেকে পুষ্ট হয়ে এসে ভেতরটাকে আরও অশান্ত করে তুলল।

ভালো দিনে সামন্তবাড়িতে আত্মীয়-স্বজন থাকতই কিছু কিছু; কিছু যাকে বলা হয় 'কুপোষ্য' সেরকমও। অশান্তির জন্য বাড়ি হলধরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে খালি হতে হতে একেবারে খালি হয়ে গেল। রইল শুধু রঘু, খেকোমণি, প্রসাদী আর ভৈরব।

ভৈরব পুরনো চাকর। গোরু-বাছুর খেতখামার ছাখে। দুটো বলদের গাড়ি আছে, একটা খেত-খামারের জন্য, একটা ছৈওলা। এ দুটোও তারই হেফাজতে। লোকটা খুব শক্তসমর্থ আর কর্মঠ। উপরে উপরে নির্লিপ্তই থাকে। তবে ভেতরে ভেতরে প্রসাদীর হাতধরা।

এক সময় ভরাবাড়ি সুখের গুঞ্জনে গমগম করত, আজকাল লোকাভাবেই নিঝুম হয়ে থেকে মাঝে মাঝে উৎকট কলহে উচ্চকিত হয়ে উঠে।...'টাকা চাই!...দেওয়া হবে না টাকা! বদ খেয়ালির জন্যে কর্তা রেখে যাননি টাকা।' স্পষ্ট উত্তর।

—আগে মাঝে মাঝে কখনও। যতদিন বাইরে গোপনে জোগাড় করবার পথগুলো খোলা ছিল, কাবুলিওয়ালা পর্যন্ত। সেগুলো বন্ধ হতে খিটিমিটি প্রায় নিত্যকার ব্যাপার হয়ে উঠল।

তারপর একদিন চরমে এসে পড়ায় চাবিকাঠি যে কত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে প্রসাদী সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আজকাল রঘু যখন টাকার জন্য আসে, প্রায়ই আসে নেশা করেই, একদিন বিকালে দিন-তিনেক বাঘ-আঁচড়ায় কাটাবার পর বাড়িতে ঢুকে গলায় চাড়া দিয়ে হাঁক দিল—'পিসি আছ?'

সঙ্গে আর একজন মানুষ। দলের নয়, সহজ ভাবও, বয়স পঞ্চাশের উপর। প্রসাদী ঘরেই একটা কাজ করছিল। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল, বলল—'রয়েছি। কথাটা কি? টাকা? টাকা নেই।'

'চাই না নিতে টাকা আর তোমার হাত দিয়ে'—উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু চোখ পাকাবার চেষ্টা করে উত্তর করল রঘু, পা দুটো একটু একটু টলছে। বলল—আমি নেউকী পাড়ার পুকুরটা বেচে দেবো। বাঘ-আঁচড়ার বামনদাস কাকাকে নিয়ে এসেছি, একবার দলিলটা দেখতে চান।...তাই না কাকা?

—ঘুরে লোকটিকেও প্রশ্ন করল সমর্থন চেয়ে।

সে প্রসাদীর চেহারা আর ভাবগতিক দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওর দিকে চেয়ে একটু মন জোগানো হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলল—'একবার একটু দখল-স্বত্বটা দেখে নেওয়া...অবিশ্যি দরকার ছিল না, বিশ্বাসেই লেনদেন হয়ে যেত—সেই রকমই সম্পর্ক কিনা—তবে ভাইপো জিদ করলে...'

প্রসাদীর চোখের উপর চোখ রাখতে না পেরে থেমে গিয়ে হাসিটা আর একটু বাড়াবার চেষ্টা করল। আরও কড়া হয়ে উঠেছে প্রসাদীর চোখ দুটো, কোটরের মধ্যে জ্বলছে। গলার স্বরটা শান্ত করে আনবার চেষ্টা করে বলল—'বুঝেছি, আর কষ্ট করে বলতে হবে না। কি সুবাদে ও রকম কুচকিকণ্ঠা খুড়ো ভাইপো জানিনে—এত দিনে কুপুষ্যির দলছাড়া তো কিছু চোখে পড়ল না—তবে বলতেই হবে, যে ভাবেরই খুড়ো হোক, খুড়োর বিবেচনা আছে, যার জন্যে শ্রাদ্ধটা আর বেশী দূর না গড়িয়ে দুটি মন্তরেই শেষ হয়ে যেতে পারে। শুনবে সে দুটি মন্তর? না, থাক, যেমন চলছে চলুক? জিজ্ঞেস করো পেয়ারের ভাইপোকে।'

অল্প ঢুলতে ঢুলতে মাথা হেঁট করে শুনছিল রঘু ঘাড়টা তুলে বলল—'বক্তিমের যে ঝড় বইয়ে দিলে?'

ঘাড়টা আর একবার লটকে যেতে চাড়া দিয়ে তুলে একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে

পিট পিট করে চেয়ে বলল,—'পরের ট্যাকায় ফফরদালালী যা হয়ে গেছে, গেছে, আর চলবে না, এই বলে দিলুম।'

প্রসাদীও একটু হাত খেলিয়ে ঠোঁট বেকিয়ে বলল—'আর তত পরের ট্যাকাও নয়, আমিও এই জানিয়ে দিলুম।'

'মানে?' —একটু যেন ধাক্কা খেয়ে চেয়ে রইল রঘু।

'মানে খুব সোজা। কত্তা এত কাঁচা মানুষ ছেল না যে বুকের রক্ত জল করে হাঁসিল করা এত বড় সম্পত্তিটে এই বাউণ্ডলে ছেলের হাতে দিয়ে যাবে।...'

'তাহলে? লিখিয়ে নিয়েছ?'—নেশা একেবারে ছুটে গেছে রঘুর, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রসাদীর মুখের দিকে।

'আমি লিখিয়ে নেব? —নিজের নামে? সে মতলব যদি থাকতো তো দাঁড়িয়ে অমন করে টলবার জায়গাটুকুও থাকত না তোমার আজ। দুবেলা দুমুঠো খেয়েছি আর তাই শোধ করতে বাড়িয়েই গেছি সম্পত্তি, ঐ ওপরে একজন সাক্ষী রয়েছে। এই সব খুড়ো-জ্যাঠা-মামাদের পাল্লায় না পড়ে যেমন চলছিল এদানি, কত্তা থাকতে, তেমনি চলে তো বহুত আচ্ছা, নৈলে...'

'নৈলে?' —সম্বিত বেশ ভালভাবেই ফিরে এসেছে, তীব্র উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল রঘু। নেশা ছুটে গিয়ে বোধহয় কিছু আন্দাজও করতে পেরে রাগ জমে আসছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। উঠোনে পাটা ঠুকে গলা চড়িয়ে তাগাদা করল,—'নৈলে কি, বলো বলো, থামলে যে?'

প্রসাদী নির্বিকারভাবে চেয়ে ঠোঁটের কোণে হেসে 'হুঁঃ করে একটু শব্দ করল, বলল, 'তাই তো গা? পুরুষের রাগ!'

তারপর লোকটির দিকে চেয়ে বলল—'নৈলে তুমিও শুনে রাখ! অতটা অচেনা নয়, খোঁজ রাখি---বাঘ-আঁচড়ার সেই গুণবতীর সুবাদেই কাকা তো? শুনে রাখ তুমিও—সম্পত্তি এখন স্ত্রীধন, ওর মধ্যে নাক গলানো চলবে না কারুর...'

'পিসি!!'— চিৎকার করে রুকে পা বাড়াতেই লোকটা ধরে ফেলল, সংযত কণ্ঠেই বলল—'চলো, ঢের উপায় আছে।'

হৃষ্টপুষ্ট শক্ত মানুষ, ডান হাতের উপরটা ধরে এক রকম টেনেই নিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ও ব্যবস্থাটা আসার কিছু দিন পরেই করিয়ে রেখেছিল প্রসাদী—সম্পত্তিটা হলধরকে দিয়ে থাকোমণির নামে লিখিয়ে রাখা। এক কথাতেই হয় নি। হলধর কাঁচা লোক ছিল না। ওপার থেকে একটা মেয়ে সঙ্গে করে এনে চেপে বসেছে, একটা অস্বস্তি এবং সন্দেহের মধ্যেই কাটল বেশ কিছু দিন, তারপর থাকোমণি একেবারে আপনারটি হয়ে গিয়ে মায়ায় জড়াল, প্রসাদীকেও নানাভাবে দেখে-শুনে একটা বিশ্বাস জমে গেল যে, সত্যিই কোনও কু-অভিসন্ধি নিয়ে আসে নি ওরা। এদিকে শোধরাবার মুখে হলেও কোন দিকে যায়, কি হয়—একটা অনিশ্চয়তাই রয়েছে রঘুকে নিয়ে, প্রসাদীর পরামর্শে রাজী হয়ে গেল হলধর। সম্পত্তিটা থাকোমণির নামেই দিল লিখে। গোপনে টাকা কোথা থেকে আসছে, কি করে আসছে, যখন উচ্ছৃঙ্খলভাবে কেটেছে তখনও তো হুঁস ছিল না রঘুর, যখন সুদরে গেছে তখনও নয়। কথাটা গোপনই রয়ে গেল।

থাকোমণির নামেই শেষ পর্যন্ত লেখা থাকে এটা যেমন হলধরের ইচ্ছা ছিল না, তেমনি প্রসাদীরও নয়। সুদরে আসছে রঘু। সম্পত্তির কদর বুঝতে পারছে, এইবার একদিন দলিল পালটে দিলেই হবে।...আর একটু দেখে এই সব ব্যাপারে মন যেমন সন্তর্পণে এগুতে চায়। সে অবস্থাও কেটে এসেছে, এমন সময় হলধর দপ করে মারা গেল।

থাকোমণির অবস্থাটা সঙীন হয়ে উঠল।

আগেই বলা হয়েছে, ওর অতীত জীবন থেকে একটা গাঢ় ছায়া নেমে এসে ওর চারিদিকে একটা বিষণ্ণতা ছেয়ে রেখেছিল। শ্বশুর বাড়িতে এ নিয়ে কারুর কোনও কৌতূহল ছিল না। ও যে পাকিস্তানের মেয়ে, এক হলধর ছাড়া এ-কথা কেউ জানত না। এ নিয়ে আলোচনা করতে প্রসাদী ওকে গোড়াতেই মানাও করে দিয়েছিল। বিষণ্ণ মেয়ের আর এক পরিচয় শান্ত মেয়ে, তাই বলেই জানত ওকে সবাই।

শান্ত মেয়েকে সবাই ভালবাসে। সবার ভালবাসার মধ্যে পেছনের সেই ছায়াটা যেন তরল হয়ে গিয়ে দিন দিন বেশ সহজ হয়ে আসতে লাগল থাকোমণি, এমনকি কিছুটা উৎফুল্লও।

সামন্ত-গিন্নী বেশ শান্তশিষ্ট বউ পেয়েছে—একটা নামডাকও বেরিয়ে গেল গ্রামে।

কিন্তু অতিরিক্ত শান্ত, অতিরিক্ত বাধ্য হওয়ার দোষও আছে। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে। এতে করে স্ত্রীকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। বুঝতে দেয় না যে স্বামীর প্রতি তার একটা দায়িত্ব আছে এবং শুধুই বাধ্য হয়ে, শুধুই চাওয়ার সঙ্গে দিয়ে দিয়ে খুশি করে সে দায়িত্বটা পালন করা যায় না।

থাকোমণির জীবনে তাই হল। গোড়ায় যখন এল বিয়ে হয়ে, তখন রঘু বেশ উন্মার্গই। প্রসাদীর পরামর্শে হলধর আস্তে আস্তে টাকা পয়সার দিকটা আঁট করে আনছিল। ঘাটতিটুকুর জোগান দিতে লাগলো শান্তশিষ্ট নববধূ থাকোমণি। নতুন জীবন, নতুন ভালবাসা। মনে হোত চাওয়াটা স্বামীর ভালোবাসারই একটা লক্ষণ, দিয়ে যেন ধন্য হোত। অবশ্য তখন কোন পথে যে ব্যয় হচ্ছে সেটা তেমন জানবার কথা নয়, হলধর-প্রসাদী যে আস্তে আস্তে গেরো করে আনছে সেটাও হচ্ছে গোপনেই।

ক্রমে অবশ্য জানল। তখন কিন্তু নিরুপায়। তখন ওদিকে মিষ্টি কথার বদলে শাসানিও শুরু হয়ে গিয়েছে। একটু বোঝাবার চেষ্টা, প্রচুর চোখের জল, কিন্তু জোগান দিয়ে যেতেই হচ্ছে গোপনে গোপনে।

তারপর কি হল, কোথা দিয়ে হল, ধীরে ধীরে সামলে গেল রঘু। থাকোমণির খানিকটা যশ হোল—এরকম বউ পেয়ে অনেক ছেলে নাকি যায় সামলে। হয়তো প্রাপ্যও অনেকটা তার। বেশ কাটল ক'টা বছর।

হলধরের অকস্মাৎ মৃত্যুতে অবস্থাটা একেবারে বদলে গেল কয়েকটা মাস পরেই। রঘু যখন পূর্ণ মুক্তিতে ডানা মেলছে, দেখলো সে একেবারে পঙ্গু। ঝোঁকটা গিয়ে পড়ল থাকোমণির ওপর। থাকোমণি আর সেরকম অনভিজ্ঞা নববধূটি নয়। কিন্তু না জুগিয়ে আর উপায় রইলো না। এমনকি বাঘ-আঁচড়া ঘটিত ব্যাপারটা শোনার পরেও, যখন রঘুর চাহিদার সঙ্গে ক্ষীরোদার আবদার যুক্ত হয়ে দাবী আরও বিপুলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এবার আরও নিরুপায়। এবার জোগান দেওয়ার অর্থ স্বামীর প্রণয়িনীর মন জোগানো জেনেও। এবার গোড়া থেকে শাসানি রঘুর, মাতাল স্বামীর শাসানি। চাপা, সুযোগ বুঝে, প্রসাদীকে এড়িয়ে। কিন্তু প্রসাদীর কাছে বেশী দিন চাপা রইল না। স্বামীর শাসানির সঙ্গে প্রসাদীর শাসানি এসে

পড়ল। একদিন বাড়ি খালি পেয়ে খুব কড়া কথায় সতর্ক করে দিল প্রসাদী। তিনজনের মাঝখানে পড়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠল থাকোমণির জীবন, তার মধ্যে একজন স্বামীর প্রণয়িনী, নারীর দাম্পত্য জীবনের প্রবলতম শত্রু।

এর পর সম্পত্তির গোপন দলিলের কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সমস্ত ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে উঠল। রঘু বাড়ি একরকম ছেড়েই দিল। বাঘ-আঁচড়াতেই কাটায়, যখন আসে চেপে বসে, দলিল পাটলে দিক থাকোমণি নইলে...

নেশার মুখে যেমন ভাষাও কদর্য হয়ে উঠেছে দিন দিন, তেমনি হরেক রকমের ভয় দেখানো—খুন হওয়া গুণ্ডা লাগিয়ে লুট করানো—ঘরে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারা, মরীয়া হয়ে যা মনে আসে।

বাধে অবশ্য প্রসাদীর সঙ্গে—যেমন জোর গলায় ওদিকে তেমনি এদিকেও। প্রসাদী আজকাল বাড়ি ছেড়ে বাইরে যায় কমই। চারিদিকে বলা আছে, রঘু এলে টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেও আসে—সমস্ত মোহড়াটা ওই সামলায়।

থাকোমণি ঘরের মধ্যে থেকে চোখের জলে বুক ভেজায়।

একদিন খুব হাঙ্গাম-হুজুৎ করে গুণ্ডা আনার ভয় দেখিয়ে রঘু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে টলতে টলতে চলে গেলে থাকোমণি বেরিয়ে এসে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়াল। মুখটা থমথম করছে, কেঁদে কেঁদে চোখদুটো জবাফুল। প্রসাদী গরগর করতে করতে সদর দরজার হুড়কো লাগিয়ে উঠান পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, নজর পড়তে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝগড়ার সময় আপনিই গাছকোমরটা বাঁধা হয়ে যায়, খুলতে খুলতে বলল—চোখ তো কেঁদে রক্তজবা হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, শুধু কাঁদলেই চলবে? আর তো কচি খুকিটি নও। সে সঙ্গে গেছে, তাকে টানা ভাল হয় না, কিন্তু শ্বশুর-বৌয়েতে আস্কারা দিয়ে দিয়ে, পাপের রসদ ভেতরে ভেতরে জুগিয়েই তো এইরকম করে তুলেছ। এনেছিলাম সামলে, আবার তো সেই হাল—এখন আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া—ঐ একটা জুটিয়েছে। এখন আর বসে বসে কাঁদবার দিন আছে, না ভেতরে ভেতরে পাপের রসদ জোগাবার?...

আক্রোশ ঝাড়বার একটা আধার পেয়ে আবার গাছকোমরটা এঁটে নিতে নিতে বলে চলল—শক্ত হও। ঐ ব্যবস্থা করে দিয়েছি, দেখলে তো? শ্বশুরের মাথাতেও ঢোকেনি, এক পিসিই বুঝেছিল—বড় মানুষের ছেলে তার

ঐরকম ছেলে। বাপ গেল তো আপদ গেল—ওই মিলিয়ে নাও সত্যি, কি মিথ্যে। আজও কি কাণ্ডটা হোত দেখতে পেতে—আজ পুকুর, কাল বাগান, পরশু খেত-খামার—তারপর একদিন দেখবে ভিটে পর্যন্ত—বিয়ে-করা বৌ ছেড়ে সেই নষ্ট মাগীর খপ্পরে…'

'যাক ও দলিল, পিসি, আমি নতুন দলিল লিখে দিচ্ছি।'

মাথাটা একটু ঘুরিয়ে শুনে যাচ্ছিল থাকোমণি, ফিরে সোজা চোখ তুলে বলল। মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রসাদী একেবারে ফেটে পড়ল—কী। বড় সোয়ামী-সোহাগী হয়েছিস থাকো!'—বলে চিৎকার করে উঠতেই থাকোমণি খুঁটি থেকে হাত দুটো সামনে এনে জোড় করে বলল, 'আস্তে পিসি, লোক জড়ো করে কি হবে? এই তো একপাল এখুনি বেরিয়ে গেল। ওদের তামাসা। আমি বলছি—মন থেকেই বলছি—যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও—সে রাখতে হয় রাখুক—জাহান্নমে দিতে হয়, দিক, এ গঞ্জনা আর সহ্য হয় না।…

বলতে বলতেই আঁচলে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল।

প্রসাদী অবাক হয়ে চেয়ে রইল, থাকোমণি এভাবে এতোগুলো কথা যে এক সংগে বলবে, বিশেষ করে তাকে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক হয়ে চেয়েই রইল কিছুক্ষণ, তারপর বল, 'বেশ, করলুম আস্তে তারপর?'

গলাটা নামিয়ে এনেছে, তবে কথাগুলো খুব চেপে বলা। সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মুখের দিকে। থাকোমণি প্রশ্ন করল—'কি, তারপর?'

'রাণী করে দিয়েছি, তাই আজ রাণীর মতন দরাজ বুক, দান-ছত্রের সীমে-পরিসীমে নেই। তারপর একে একে পুকুর-বাগান ক্ষেত-খামার গিয়ে যখন ভিটেতে হাত পড়বে, রাণী দাঁড়াবেন কোথায় জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

তীব্র শ্লেষে কথাগুলো বলে ঠোঁট-নাক অল্প কুঁচকে মুখের পানে চেয়ে রইল। নিরুত্তর দেখে প্রশ্ন করল—'আর কূল পাচ্ছেন না রানী?'

থাকোমণি চোখদুটো বাইরের দিকে করে নিয়েছিল, ঘুরিয়ে এনে প্রসাদীর মুখের উপর রাখল। চোখদুটো আবার ঘুরে গিয়ে ফিরে এল, যেন একটা কথা বলা চলবে কিনা বুঝতে পারছে না।

'চুপ করে যে?'—আবার তাগাদা দিতে হোল প্রসাদীকে। থাকোমণি আরও সেকেণ্ড কয়েক সময় নিয়ে বলল,—'লোকটা বোধহয় তত খারাপ নয় পিসি।'
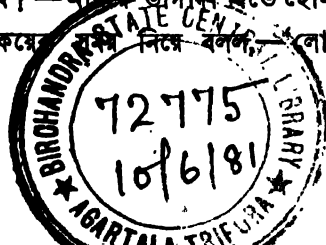
বিরোধ বাধল এদিকেও। এ-বিরোধ আবার নির্বাক বিরোধ, আরও অসহ্য। বাড়ির মধ্যে স্থায়ী বসবাস দুটি মানুষের প্রসাদী আর থাকোমণির—তাদের মধ্যে কথা বন্ধ দরকার হল তো দেওয়ালকে উদ্দেশ করে, ভৈরব রইল তো তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কাজ চালানো।

শুরু করল প্রসাদীই।

বৃহস্পতিবারে একটা ছোট করে লক্ষ্মীপুজো হয় বাড়িতে, প্রসাদীই এসে চালিয়েছে। সন্ধ্যার একটু আগে থাকোমণি বলল—'পিসি, ভৈরবকাকা এসেছে ঠাকুরের শেতলের মিষ্টিটা আনিয়ে দেবে? পুরুতমশাইয়ের আসবার সময় হয়ে এল।...দাঁড়াও কাকা।'

ভৈরব গাই-বলদ গোয়ালে তুলে সাঁজালের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াতে প্রসাদীর গলা খন-খন করে উঠল—'ভৈরব, বলো বাঘ-আঁচড়া থেকে তাকে ডাকিয়ে যা বলবার বলুক—আমার দ্বারা এ-বাড়ির আর কিছুই হবে না। ঢের করেছি, তার ফলও পাচ্ছি।...আর দরকারই বা কি লক্ষ্মী-পুজোর? মা চঞ্চলা, এসেছিল বাহন নিয়ে যেতে, তাড়িয়েছি—কিন্তু কতবার তাড়াব—ঘরেই যখন তাকে আদর করে ডেকে আনবার সরঞ্জাম!...এই নিক, পিসি সব দায় থেকে খালাস—আমায় যেন কিছু না বলে আর—তাহলে হুলস্থুল কাণ্ড করব!'

চাবির থেলোটা আঁচল থেকে খুলে ঝনাৎ করে থাকোমণির পায়ের কাছে ফেলে দিল।

সাতদিন একভাবে চলল। অসহ্য হয়ে এসেছে। বারদুয়েক কথায় নামাবার চেষ্টা করল থাকোমণি। উত্তর পেল না, যা পেল তা ঐরকম তীব্র শ্লেষ। এটা মাঝে মাঝে এক-আধবার করে নিজে হতে চালিয়েই 'যাচ্ছে প্রসাদী, অকারণেই কোনও একটা ধুয়া ধরে নাক-মুখ কুঁচকে চিপটেন কাটা—নিজের মনটা খালি করে নেওয়া, বাষ্প যখন জমে উঠছে ভেতরে চুপ করে থেকে। সোজাসুজি থাকোমণিকে কিছু নয়, তবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবটুকুই তাকে টেনে জোগান দিত রঘু বাঘ-আঁচড়ার কাকা আর ক্ষীরোদা।

এর পর একদিন আবার থাকোমণিকে সোজাসুজি।

ঐ অসহ্য চিপটেন কাটার মধ্যে থাকোমণি—ও পিসিমা, আর কতো!'—বলে কেঁদে, উঠে পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়েছে, প্রসাদী চিৎকার করে উঠল—'তোর গোট থাকো! কোমরের গোট কি হল?'

এ রূপোর গহনাটার আজকাল রেওয়াজ না থাকলেও মায়ের দেওয়া বলে পরতো থাকোমণি। উপুড় হয়ে পড়তে ব্লাউসের খানিকটা উঠে গিয়ে নজরটা শূন্য কোমরের উপর আটকে গেল প্রসাদীর।

থাকোমণি পা দুটো আরও চেপে ধরেছে কপাল দিয়ে, 'বলি শুনতে পাচ্ছিস কি বললুম? গোটগাছাটা কোথায় তোর?'—বলে টেনে নিল পা। থাকোমণি মাথা তুলে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'ছাড়লে না কোনও মতে, পিসি। গায়ে তো সোনার কিছু রাখি না, তুমি মানা করা অবধি।'

'তুই,···তুই! ভেতরে ভেতরে।···এখনও!'···'

—কাঁপছে প্রসাদী, কি বলবে যেন গুছিয়ে ভেবে উঠতে পারছে না।

গলার স্বরটা চেপে নেমে এসেছে। 'কবে খুলে দিয়েছিস? আমি এদিকে ·'

'অনেক আগে পিসি···আজকাল তো আসে না···যখন যখন আসে তুমি থাক—ভরসা পাই একটা···'

কাতরতার সঙ্গে খোসামোদে ভিজে এসেছে গলার স্বর। প্রসাদীর কানে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না গলা আরও চেপে বলল—'তোর গয়নার বাকস বের কর, দেখব আমি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে দেখে তাগাদা দিল—'করলি বের?'

'কি করবে আর দেখে পিসি?···বলছি তো, গেছে কিছু···'

'আমি দেখব। তারপর কি করব তুই-ও দেখবি।···বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।···আমি প্রাণপাত করছি কি করে সোদরাই ছোঁড়াটাকে—দিয়েইছি যখন আবাগীকে হাতে তুলে—জেতের বিচারও করলুম না—এনেওছিলুম সুদরে—দেখলেও—এদিকে ভেতরে ভেতরে···উঠলি?'

পা না পেয়ে মাটিতেই লুটিয়ে দিয়েছিল কপাল থাকো, উঠে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের দিকে দুপা এগিয়েছে, প্রসাদী স্বরটা একেবারেই চেপে দিয়ে বলল—'থাম, আর যেতে হবে না।'

বুকটা উঠানামা করছে, নিশ্বাস পড়ছে, যেন একটা ফণাধরা অজগরের ফোঁসফোঁসানি। বলল—'যেতে হবে না—এগিয়ে আয়।

থাকোমণি এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। প্রসাদী বলে চলল—'যেতে হবে না, আমার আর সম্বন্ধ কি? যার জন্যে করা সেই যখন···তবে, জানিস, এত সোহাগ, এও আমি এক কথাতে ভেঙে দিতে পারি থাকো—একটি কথা,

সঙ্গে সঙ্গে এত যে মান—এই আমিই যে এত করে এত উঁচুতে এনে বসিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেশ্যে মাগির চেয়েও নেমে যাবি—ঐ অত সোহাগের স্বামীর কাছেই—কার কাছেই বা নয়?…'

'পিসি!!'—বলে একেবারে আছড়ে পড়ল থাকোমণি পায়ের ওপর, এবার পায়ের পাতা দুটো চেপেও ধরল।

॥ ছয় ॥

ধর্ষিতা নারী। তার নিজের কোনই অপরাধ নেই, অথচ সমাজ থেকে স্খলিতা হয়ে পড়ল, অনেক ক্ষেত্রে কাপুরুষের মতোই যারা রক্ষা করতে এগুল না, মহাপুরুষের মতোই তারা নির্বিচারে সমাজচ্যুত করে দিল। শাস্ত্রের নির্দেশ। যে শাস্ত্রকেই সমাজচ্যুত করার কথা, যদি দিয়ে থাকে এমন নির্দেশ, যদি পুষ্ট করে যেতে থাকে এমন মহাপুরুষের দল।

এবার প্রসাদীর দায় সহজ ভাব ফিরিয়ে আনার। অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে পড়েছিল। অথচ রোষের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েও ও কখনও ভারসাম্য হারায় না, যার জোরেই এত বিপদের মধ্যে এতটা সামনে আসতে পেরেছে, শেষ পর্যন্ত পারবেই এ বিশ্বাসটা ধরে রাখতে পেরেছে।

মনটা খুবই ভার হয়ে রয়েছে।

বোশেক মাস। আকাশটা বেশ থমথমে। সন্ধ্যার পাটই সারছিল প্রসাদী, তবে মন্থরগতিতে। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে।… ওর প্রশ্ন—নিজের কাছেই—এমন ইতিঙ্গটা বের করল কি করে মুখ দিয়ে। একদিন ওই না ঠাকুরের বেদি ছুঁইয়ে থাকোমণিকে শপথ গালিয়েছিল, কখনও প্রকাশ না করে কথাটা কারুর কাছে।

পাট সারছিল উঠানে—বারান্দায়, ঘুরে ঘুরে, থাকোমণি ঘরে, আড়চোখে এক একবার দৃষ্টিও ফেলছিল সেদিকে। একবার বেরিয়ে আসতে বলল—'লেগেছে নিশ্চয় কপালে? অমন করে আছড়ে পড়তে হয়?'

'না, লাগেনি।' মুখ নীচু করেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আবার বলল—'পায়ের ওপর পড়ল তো?'

'আর পায়ের ওপর পড়া! কথায় বলে রাগ না চণ্ডাল।'

থাকোমণি পাশের ঘরটায় চলে গেল। আকাশের মতই মুখটা থমথমে।

আবার বেরিয়ে এলে—ঐদিকেই আড়চোখে চেয়েছিল প্রসাদী—প্রশ্ন করল —'হ্যাঁরে থাকো, সে কথাটা কাউকে জানতে দিসনি তো?'

দাঁড়িয়ে পড়ল থাকোমণি। অদ্ভুত একটা হাসি ফুটেছে ঠোঁটের কোণে, মেঘলা আকাশের পাণ্ডুর আলো পড়ে আরও করুণ দেখাচ্ছে, বলল—'আমার পাপের কথা আমিই বলব পিসি?'

'পাপ! মাথায় থাকুক এমন শাস্তোর।··· না, বলবিনি। তেমন ভাবের কাউকে পেলে মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে দুঃখের ঝোঁকে, তাই বলছিলাম। বের করে নেবার লোকও আছে। ওপারের কথা তুলবিইনে একেবারে। বুঝলি? না, তুলবিনে।'···'

থাকোমণি একটা কি হাতে করে এ ঘরে চলে এসেছে। বলেই চলল প্রসাদী, একটু ঘাড়টা বাড়িয়ে দেখেও নিচ্ছে। একটু থেমে প্রশ্ন করল— 'শুনলি কি বললুম?'

কোনও উত্তর না পেয়ে উঠান থেকে গলাটা বাড়িয়ে ওকে চোখে আঁচল দিয়ে সিন্দুকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর না ঢুকে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল—'মুয়ে আগুন, রাগ না চণ্ডাল।'

—নিজেকে উদ্দেশ করেই।

অন্যমনস্কভাবে ঘুরে ঘুরে কাজ খুঁজতে খুঁজতে তুলসীমঞ্চের পেতলের প্রদীপটার ওপর নজর পড়ল। একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল। দিনের আন্দাজে সন্ধ্যা না হলেও মেঘলা আকাশের জন্য অকালসন্ধ্যার ভাব একটা।

'না, সন্ধ্যেটা জেলেই দিই—আজও মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। – এ বছর যেন বাড়াবাড়ি।' নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গিয়ে প্রদীপটা তুলে নিয়ে তেল দেওয়ার জন্যে ভাঁড়ারের দিকে দু-পা এগিয়েছে, কি ভেবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। থাকোমণি ঘরের ভেতরেই, গলাটা একটু বাড়িয়ে দেখল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন আন্দাজেই তাকে উদ্দেশ করে একটু গলা তুলে বলল—'কিকরছিস ভেতরে? আমি বলছিলুম তুলসীতলায় পিদিমটা জেলে দিয়ে দে মা। বলছিলুম, এবার থেকে তুই-ই ওটা দিবি—বাড়ির বৌয়েই দেয়, সেই ভালো। নে, বেরো আজও আবার কালবোশেকী উঠকে পারে। কী যে হয়েছেএবার!'

একেবারে অনেকগুলো কথা। মিষ্টি গলায়। কথা দিয়ে হাত বুলানো গায়ে। দৃষ্টি আড়ে ঘরের দিকেই।

থাকোমণি ওদিকে মুখ করেই চোখ দুটো মুছে নিয়ে বেরিয়ে আসতে বলল—এবার একটু মৃদু তিরস্কারের স্বরেই বলল—'ওকি অলুক্ষণ, ভরসন্ধ্যের বৌ-মানুষের চোখে জল!···নে ধর, তেল দিয়ে পিদিমটা তুই বসিয়ে আঁচল দিয়ে গড় করে আয়—কবে যে অলুক্ষণ সব দূর করবেন মা!'

এরপর আর একবার।

আকাশের ঐরকম অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি রান্নার পাট সেরে খেয়ে দেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল। দুবেলার রান্নাটুকু একজন বিধবা ব্রাহ্মণী এসে করে দিয়ে যায়। যদি কখনও ব্রাহ্মণ-কায়েৎ-অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়ল, তাই বরাবরই এই ব্যবস্থা। যোগাড়-যন্ত্র করে দেয় প্রসাদী। থাকোমণির কিছু করবার থাকে না, তবে গল্প-সল্প করবার জন্যে রান্নাঘরের একদিকে একটা পিঁড়ি পেতে বসে থাকে। হয়তো এটাসেটা এগিয়েও দিল ঐ পর্যন্ত, কাজের কিছু করতে দেয় না প্রসাদী।

আজ একবারও এল না।

মনটা খুবই চঞ্চল প্রসাদীর। বার দুই বেরিয়ে কিছু একটা আনবার ছুতো করে শোবার ঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চোখের কোণে দৃষ্টি ফেলে। একবার চৌকাঠের এদিকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—'শুয়ে যে?'

'এমনি।' মাথাটা একটু ঘুরিয়ে উত্তর করল থাকোমণি। প্রসাদী বলল—'খাবি আয়—ভাত বাড়ছে বামন ঠাকরুণ।'

থাকমণি ঘুরে পিঠটা পর্যন্ত তুলে বলল—'খাবো না পিসি, শরীরটে ভাল নয়।'

'শুয়ে কেন, না, এমনি; খাবি আয়, না, শরীরটে ভাল নয়—এসব বায়নাক্কা ছাড় থাকো।' একটু রেগেই গেল প্রসাদী। হুকুমের টোনেই বলল—'নে আয় খাবি আয়।'

এর পর একেবারে গভীর রাত্রে।

ঐ চিন্তা নিয়েই ছমছমে তন্দ্রার মাঝে কখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ ছ্যাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসল প্রসাদী। বুকটা ধড়ফড় করছে। একটু, যেন কিছু বুঝতে না পেরে, আচ্ছন্নভাবে বসেই রইল, তারপর নামল বিছানা থেকে। পাশের ঘরটাতেই আজকাল শোয়। এদিকে রঘু

আসা বন্ধ করায় মাঝখানে একটা দোর ফুটিয়ে নিয়েছে। খোলাও থাকে সেটা। কম্পিত পদেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে দেখল থাকোর বিছানা শূন্য। হেঁকেই ডাক দিতে যাচ্ছিল, স্বরটা গলায় আটকে গেল। যদি সাড়া না পায়!

বেরিয়ে এল, মনে হচ্ছে হাঁটু মুড়ে এইবার পড়ে যাবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিজের হাত দেখা যায় না। তখনই একটা বিদ্যুৎ ঝলকে নজর পড়ল—হাত চারেক দূরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে পা নামিয়ে বসে আছে থাকো।

'তুই এখানে!' খনখনে আওয়াজ প্রসাদীর।

'কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ভেতর থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে এল। একটু এগিয়ে তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করল—'বলি, তুই এখানে এমনভাবে বসে যে? এই দুষমণ রাত!'

ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের পানে চেয়ে রইল থাকোমণি। দৃষ্টি যেন অবুঝ, অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তই। একটা ঢোঁক গিলে বলল—'ঘুম হচ্ছে না।'

'হবে ঘুম, ওঠ।'—এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের নাড়াটা ধরে তুলল।

সেই শেষ কথা দুজনে।

এর পরে সে রাত্রের যা ঘটনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল একেবারে প্রায় বছরখানেক পরে।

॥ সাত ॥

সেই রাত্রেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়টা উঠে একেবারে তছনছ করে দিল চারিদিকটা।

সকালে লাসটা চালান হয়ে গেল থানায়। প্রসাদী যতটা সহজে ভেবেছিল তত সহজে শেষ হল না ব্যাপারটা, হওয়ার কথাও নয়। থানা থেকে লাস সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে ময়না তদন্ত হয়ে গেল। অধিকারীদের কেহ নেই, লাস রাখা যাবে না, বিকৃত হয়ে পড়বে, হাসপাতাল থেকে দাহরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাড়ির দিক থেকে রইল মাত্র ভৈরব।

সেদিন—অর্থাৎ লাস চালানের পরদিন ভৈরব ফিরেও এল সকালে, থানাতেই রাত কাটিয়ে। তবে একলা নয়। সঙ্গে একজন পুলিশ, তাছাড়া চৌকিদার রহমৎ শেখও রইল। খাওয়াদাওয়াও করল সামন্তবাড়িতেই। কেন

আসা কেন থাকা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে জানাল, তারা নিজেই জানে না, থানার দারোগার হুকুম এইরকম। একটা চাপা আতঙ্কের ভাব লেগে রইল! গোড়ায় কৌতূহলবশে একটু যাওয়া আসা হলেও, প্রতিবেশীরা এদিকটা আসা বন্ধই করে দিল। প্রসাদীর বাইরে যাওয়ার একটু বরাৎ ছিল, বেরুতে যাবে, পুলিশ আর রহমৎ চালাটায় বসে তামাক খাওয়ার সঙ্গে গল্প করছিল, বারণ করে দিল৷ ভৈরবকে করাই ছিল বারণ। কথা বেরিয়েই যায় হাওয়ায় উড়ে; কৌতূহলে উদ্বেগে গ্রামটা থমথমে হয়ে রইল।

বিকালে একটা জীপে করে থানার দারোগা দুজন পুলিশ সঙ্গে করে উপস্থিত হওয়ার পর ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। ময়না তদন্তের রিপোর্ট—মৃত্যুটা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা নয়। হত্যা করে টাঙিয়ে রাখা। হত্যারও একটু বৈচিত্র্য আছে। প্রথমে কোনও ভোঁতা অস্ত্রের সাহায্যে কতকটা যেন থেঁতো করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়; তারপর ধস্তাধস্তি করে পরাভূত করে টুঁটি টিপে দম আটকে দিয়ে হত্যা করা হয়।

গুরুতর কেস। হত্যা করে আত্মহত্যার চাপা দেওয়ার চেষ্টা। অকুস্থলে তদন্তের জন্য থানা থেকে দারোগার আসা, ভৈরব আর প্রসাদীর ওপর নজর রাখাও ঐ জন্য।

এসেই চারিদিকটা দেখে শুনে উঠানের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল পাতিয়ে রীতিমতো আদালত বসিয়ে দিলেন দারোগা। রঘুর অনুপস্থিতিতে প্রসাদী থেকে এজাহার শুরু হোল। দীর্ঘ এজাহার। সামন্তবাড়ি এ-তল্লাটে বিশিষ্ট বাড়ি, নানা কারণে রঘুও পুলিশের অপরিচিত নয়—এতবড় কাণ্ডের পরও সে অনুপস্থিত, তারই খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন বেশি।...

ঘটনার দিন সকালে খুব হৈ-চৈ করে নেশা করে এসে—তারপর আর আসেনি—আজকাল থাকে বেশিরভাগ বাঘ-আঁচড়ায়। এজাহারে রাখতে হয় তাই প্রশ্ন, নয়তো বাঘ-আঁচড়াঘটিত ব্যাপার দারোগার কাছে অজ্ঞাত নয়, পূর্বেই সংগ্রহ করা রহমতের কাছে।

গ্রামের লোক সঙ্গে দিয়ে একজন পুলিশকে আগেই সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জীপে করে। জীপটা খালিই ফিরে এল, রঘু, বামনদাস, ক্ষীরোদা—কেউই নেই সেখানে।

প্রসাদীর পর ভৈরব, তারপর কয়েকজন প্রতিবেশী মাতব্বর। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। পেট্রোম্যাক্স আলো জেলে এজাহার চলল। মেঘলা

অন্ধকার রাত্রি, রাত হওয়ার সঙ্গে বাইরে ভিড়ও জমে উঠতে লাগল। দারোগা এজাহারই নিয়ে যাচ্ছেন, মন্তব্য কিছু করছেন না, তবে এজাহারের মধ্যে দিয়েই হত্যাকারী যে কে কি স্বার্থে যে এরকম নৃশংস হত্যা, সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সমস্ত গ্রামটায় সাড়া পড়ে গেল।

গোয়ালঘরটা বাইরে, তবে বাড়ির সংলগ্ন। ভেতর থেকে যাওয়া আসা করবার জন্যে উঠোনের দিকে একটা দরজা আছে। গোরু বলদ ঢোকবার চওড়া আগল বাইরের দিকেই। হাত-তিনচার পরিষ্কার, তারপরই একটা কলাবাগান। হলধর মারা যাওয়ার পর বাড়ির শ্রী গেছে নষ্ট হয়ে। বাগানটা আগাছায় ভরে জঙ্গল হয়ে গেছে।

ভৈরব অন্যান্য সাক্ষীদের সঙ্গে উঠোনেই বসেছিল, বাইরে যাওয়া বারণই। হঠাৎ গোয়ালঘরে গরুবলদগুলো ধড়ফড় করে ওঠায় দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে প্রশ্ন করল—"আজ্ঞে, দেখে আসব একবার? গোবাঘাও এসে।"

দারোগা ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—"যাও দেখে এসো।"

উঠোন থেকেই একটা বাঁশের আগালে তুলে নিয়ে শেকলটা খুলে ভেতরে চলে গেল হ্যাট হ্যাট আওয়াজের সঙ্গে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা কেরোসিন তেলের কুপি জ্বলে, হাওয়ায় নিভে গেছে। দেশলাই বের করবার জন্যে পকেটে হাত দিতে যাবে, কাঁধে পেছন থেকে চারটে আঙ্গুলের চাপ। পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলোর পর আরও ধাঁধা লেগে রয়েছে চোখে, ভৈরব "কে?" বলে চেঁচিয়ে উঠতেই যাচ্ছিল; তার আগেই ফিস্‌ফিস করে আওয়াজ হল—"চুপ, আমি রঘু। আলো জ্বালবে না। এদিকে।"

ঘরটা লম্বা; একটা কোণের দিকে চলে গেল দুজনে। ভৈরব ফিসফিস আওয়াজে প্রশ্ন করল—'কোথায় ছিলে?'

"সে কথা থাক। শুনলাম নাকি আত্মহত্যা নয়?"

"না, রিপোর্ট, গলা টিপে মেরেছে—পেলিয়েছ, তাই তোমার নামেই দোষ পড়ছে। দেখা করে সাফাই দেও না।"—চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে।

রঘুরও স্বর বেশ সহজ নয়। বলল—"পাগল? .....যাও চলে, সন্দো করবে।"

"আর তুমি ?"—প্রশ্ন করল ভৈরব।

"পরে জানতে পারবে, এখন যাও। বলবে গো-বাঘাই ছিশ বোধহয়: কলাবাগানের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। আমার কথা কাউকেও নয়। যাও, যাও এবার।"

ঘরের শেকল তুলে দিয়ে ভৈরব যখন উঠোনে এসে দাঁড়াল তখন সে যেন সম্বিতহারা। না বসে দাঁড়িয়েই ফ্যালফ্যাল করে চোখ ঘুরিয়ে দেখছিল, দারোগার নজর পড়তেই, 'কি হল ?' বলে প্রশ্ন করতে—একটু কড়া ভাবেই প্রশ্ন করতে, যেন চমক ভেঙে হাতজোড় করে উত্তর করল—এজ্ঞে গোবাঘাই ছেল মনে হয়।"

"বোস।"

চোখের ইঙ্গিতের সঙ্গে একটু বিরক্তভাবে হুকুম দিতে বসে পড়ল ভৈরব।

তদন্ত শেষ হতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। এজাহারের দিকটা শেষ করে টর্চ আর পেট্রোম্যাক্সের সাহায্যে আর একবার সব দেখে নিলেন দারোগা, বাড়ির চৌহদ্দি থেকে ভেতর বাড়ির ঘর-বারান্দা গলিঘুচি সব। এসেই লাস যে-ঘরে টাঙান অবস্থায় দেখা যায়, প্রসাদীর বিবরণ মতো সে ঘরটা ওর শোওয়ার ঘর, লোহার সিন্দুক—এসব একচোট দেখে নিয়েছিলেন, ওর পুরো এজাহার এবং আর সব সাক্ষীদের এজাহারের পর যেন মিলিয়ে মিলিয়ে আর একবার দেখে নিলেন। বিশেষ করে যে ঘরে লাসটা টাঙানো পাওয়া যায় তার মেঝে আর কোণে কোণে টর্চ ফেলে ফেলে। কোনও মন্তব্য করছেন না, তবে সঙ্গে যারা ছিল—দু-তিনজন মাতব্বর প্রতিবেশী আর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট সবাই বুঝল রক্তের কোন চিহ্ন আছে কিনা অনুসন্ধান করছেন। ফিরে এসে আবার উঠোনের চেয়ারে বসে প্রসাদী আর ভৈরবকে প্রশ্ন করলেন—ঘরটা ধুয়ে ফেলা হয়েছিল কিনা। দুজনেই উত্তর করল—না, লাস বের করে আনার পর আর ওঘরে যাওয়াই হয়নি। দারোগা যেমন দেখলেন সেইরকম শেকল দেওয়াই ছিল।

কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে দারোগা চলে গেলেন।

আপাতত একজন পুলিশ আর চৌকিদার রহমৎ শেখ এখানে মোতায়েন থাকবে। ভৈরবের খেতখামারের কাজে গাড়ি নিয়ে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সঙ্গে রহমৎ বা পুলিশ কেউ একজন থাকবে। খেত-খামারে কাজ ভিন্ন ভৈরব বাইরে কোথাও যেতে পারবে না, প্রসাদী একেবারেই নয়। রঘুর

সন্ধান পেলেই তখনই তাকে তদবস্থাতেই আটক করে পুলিশ বা রহমতের দ্বারা থানায় খবর পাঠিয়ে দিতে হবে। পঞ্চায়েতের প্রধানের ওপর এসব বিষয়ের সাধারণ দায়িত্ব ন্যস্ত রইল।

কোনও মন্তব্য করলেন না। তবে ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট। রঘুর এদিকের আচরণ, আগের সব দিনেরও হুমকি, লোহার সিন্দুকের মধ্যে থেকে গহনার বাক্সের অন্তর্ধান—সব মিলিয়ে এতে আর সন্দেহ থাকে না যে রঘুরই কাজ এটা। তবে অন্তত প্রসাদীরও যেন টান পড়ে খানিকটা—পাশের ঘরেই শোয় অথচ এতটা কাণ্ড ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। যে ঘরে লাস পাওয়া যায় বলে ও জানাল দারোগাকে, সেটা অবশ্য তিনটে ঘরের পর বারান্দার শেষ ঘরটা। ওর নিজের এজাহার মতো, না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঐ ঘরে গিয়ে ছ্যাখে থাকোমণি ঝুলছে—এটা সত্য হলে ওর না জানাটা অস্বাভাবিক নয় তেমন। কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্ট ঠিক হলে ওর সম্বন্ধেও সন্দেহটা থেকেই যায়।

একটা মেয়েছেলে, আর ওই ধরনের মেয়েছেলে, হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল, এতটা প্রতিপত্তি ক'রে নিল—এর পেটে পেটে কি মতলব ছিল, কে বলতে পারে?

রোকা, একগুঁয়ে মেয়েছেলে, পাড়ায় গ্রামে মহালে কোথাও বিশেষ অপরিচিত ছিল না প্রসাদী—ওর এইভাবে জড়িত হয়ে পড়া—সত্যমিথ্যা যেভাবেই হোক, ভালোই লাগল অনেকের। অনেকদিন পর্যন্ত সামন্তবাড়ির আলোচনাটা গ্রামের প্রধান আলোচনা হয়ে রইল।

কোনও অছির অভাবে সম্পত্তির তদারক সরকারী ব্যবস্থায় হতে লাগল।

॥ আট ॥

ভারত আর পাকিস্তানের যুগ্ম সীমান্ত। স্বাভাবিক বাধা-অন্তরায় বিশেষ কিছু নেই। কোথাও একটি প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ রাজপথ, কোথাও একটা সঙ্কীর্ণ বনরেখা, কোথাও একটা সঙ্কীর্ণ নদী। তাও স্বভাবতই খানিকটা খানিকটা ক'রে। খুব বড়, দুরতিক্রম্য অন্তরায় হোল পদ্মা, তাও সম্পূর্ণ নয়।

দুটি শত্রুভাবাপন্ন জাতির এ ধরনের যুগ্ম সীমান্ত যেমন বিপজ্জনক সাধারণ মানুষের পক্ষে, দুষ্কৃতদের পক্ষে তেমনি স্বর্গভূমি। এক দিকে কোনও রকমে পুলিশের হাত এড়িয়ে সীমান্ত টপকে অন্য দিকে গিয়ে পড়তে পারলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শুধু অন্যদিকে জমিটা একটু তোয়ের ক'রে রাখলেই হল।

এ জমি তোয়ের ছিল রঘুর। বামনদাস আর ক্ষীরোদা আসবার পর থেকে। বামনদাস ক্ষীরোদাকে জুটিয়ে দেয় পাকিস্তান থেকে এনে। বামন-দাসের মূল কারবার ছিল স্মাগলিং অর্থাৎ চোরাই মাল এপার থেকে ওপারে ওপার থেকে এপারে। তার মধ্যে সুযোগমত এটা-সেটাও চালিয়ে দিত।

বাড়ীতে আসুক বা নাই আসুক, বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগটা বরাবর রেখে যেত রঘু। নিজে এল তো ভালই, নয়তো প্রতি দিনের মোটামুটি খবরটা সে পেয়ে যেত তার এক প্রতিবেশী বন্ধুর কাছ থেকে। ওর পাপচক্রেরই একজন সমবয়সী বন্ধু। নাম বেচারাম গরুই।

যেদিনকার ঘটনা, আত্মহত্যার কথাটা চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারাম বেরিয়ে পড়ল বাঘ-আঁচড়ার দিকে। রঘুও ঝড়ের পর বাড়ির অবস্থা দেখবার জন্য বেরিয়েছে, খানিকটা এসে পথেই তার সঙ্গে দেখা। ওকে সঙ্গে করে ফিরেই এল বাঘ-আঁচড়ায়। অতি গুরুতর ব্যাপার, সব আন্দাজেরই বাইরে। বামনদাসের সঙ্গে পরামর্শ দরকার।

বামনদাস দূরদর্শী, অনেক দেখেছে, এ ব্যাপার যে অল্পে মিটবে না শুধু থাকোমণিকে হারাবার মধ্যে দিয়ে, সেটা খতিয়ে নিতে দেরী হল না। বাইরে বাইরে ক্ষীরেদা আর সে নিজে ঘটনাটার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মনে হলেও হয়তো তাদের টানই আগে পড়তে পারে, এটাও বুঝে নিল বামনদাস। বিলম্ব না করে ক্ষীরোদাকে সঙ্গে করে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে গেল বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে। সেখানে সব ব্যবস্থাই ঠিক করা থাকে। ঠিক হল, রঘু গ্রামেই চলে গিয়ে খোঁজ-খবর নেবে। প্রথমটা প্রচ্ছন্নভাবেই। যদি তেমন কোনও গোলমালের সম্ভাবনা না ছাখে যদি বোঝে চৌকিদার রহমৎকে 'খুশী' করলে ব্যাপারটা মিটে যায় তো আত্মপ্রকাশ করে বাড়িতে উঠবে। তারপর যা যা হয় বেচারামের মারফৎ জানাতে থাকবে। বামনদাস অবস্থা বুঝে বেচারামের মারফৎই পরামর্শ দিতে থাকবে।

গ্রামে ঢুকেই রঘু জানতে পারল, দাহর ব্যবস্থা না করেই লাস থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানা-পুলিশের গন্ধ পেয়ে আর আত্মপ্রকাশ করল

না। তার পরের খবর, বাড়িতে দারোগা-সেপাই এসে আদালত বসিয়েছে, বাড়ি নজরবন্ধ। আর আত্মপ্রকাশের কথাই ওঠে না। কড়া পাহারা, কি হচ্ছে না হচ্ছে, চর লাগিয়েও জানবার উপায় নেই। অন্ধকার ভালো করে ঘনিয়ে এলে একবার উল্টো দিক থেকে জঙ্গলাকীর্ণ কলাবাগানের মধ্যে দিয়ে গোয়াল-ঘরে প্রবেশ করল, কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের দরজা চেপে দাঁড়াল। উঠোনের কড়া পেট্রোম্যাক্সের আলোয় সব দেখাও যাচ্ছে, শোনাও যাচ্ছে সব। ভৈরব গোবাঘার উপদ্রব আশঙ্কা করে ভেতরে আসবার অনুমতি পেতে, সতর্ক হয়ে দাঁড়াল রঘু। শেষ পর্যন্ত শুনলও না। তার দরকারও ছিল না। আর থাকা নিরাপদও নয় আদপেই। যেমন এসেছিল, বনে-অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর বাঘ-আঁচড়ার পথও নয়। খানিকটা সরে নদী পেরিয়ে ঘুরে সীমান্ত পেরিয়ে রাতারাতিই বামনদাসের পাকিস্তানের ঘাঁটিতে গিয়ে উঠল রঘু।

মাস তিনেক কাটাল সেখানে। নিঃশঙ্কেই এক রকম। তবু এ ধরনের নিত্য আশঙ্কার মধ্যে থাকায় অভ্যস্ত নয়। নিরুপায় হয়েই থাকা। গয়না-নগদে হাতে যা ছিল ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বামনদাসেরও আদর কমে আসতে লাগল। এখানে থাকতে হলে তাকেও যে বামনদাসের রকমারী কারবারে আস্তে আস্তে হাত পাকাতে হবে, এ ধরনের ইঙ্গিত ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল বামনদাসের কাছ থেকে। কয়েকবার এক-আধ দিনের জন্যে সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করে থাকবার চেষ্টাও করল রঘু। বিফল চেষ্টাই। তাতে শুধু বমনদাসের মূল্যটাই বাড়ল—যেমন তার কাছে, তেমনি বামনদাসের কাছেও। সে খলিফা লোক, হয়তো ভেবেছিল, জীবনে কত সম্ভাবনাই আছে, ভবিষ্যতে খেলার ঘুঁটি হিসাবে রঘুকে হাতে রাখলে কাজে আসতে পারে, ওর অস্থিরতা দেখে মত পাল্টাল। কিম্বা মতটা সেই রইল, তবে দূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা আর সুবিবেচনার কাজ মনে করল না।

রঘু একদিন ক্ষীরোদার কাছে একটা প্রচ্ছন্ন সংবাদ পেল—ওপারের পুলিশ রঘুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে পাঁচ হাজারের যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তাতে হয়তো বামনদাসের লোভ থাকতে পারে। সেও ওই গোষ্ঠীর স্ত্রীলোক। তবু, দেহ বিক্রয়ের সঙ্গে কোনও কোনও স্ত্রীলোকের মনেরও কিছুটা দিয়ে ফেলার দুর্বলতা থেকে যায়। রঘু তখন প্রায় নিঃসম্বলই। কিছু পাথেয়েরও

ব্যবস্থা করে দিল মোক্ষদা। নগদের সঙ্গে খান-দুই গহনা, রঘুরই দেওয়া থাকোমণির গহনা। ও আরও উত্তরের দিকের মেয়ে। এখান থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে। সেইখান থেকে যাতে সীমান্ত পেরুতে পারে, পুলিশের সন্দেহকে এড়িয়ে—তারও ব্যবস্থা করে দিল।

॥ নয় ॥

কিন্তু বামনদাসের চোখে ধূলা দেওয়া এত সহজ নয়। ক্ষীরোদা যে হাজার সতর্কতার মধ্যে খবর রাখতে পারে, ওর শ্রেণীর স্ত্রীলোক যে যেমন কারুর নয়, তেমনি আবার সবারও, এ জ্ঞান না থাকলে এ জাতীয় কারবার চালাতে পারত না বামনদাস। সতর্কই ছিল। যখন বুঝল রঘুর এ-যাওয়া এক-আধ দিনের জন্য রোজগারের চেষ্টায় যাওয়া নয়, আর বিলম্ব করল না। রঘু যদি সীমান্ত পেরোয় তো বহু দূরে কোথাও দিয়ে পেরুবে। যদি ক্ষীরোদার সহায়তায় হয় তো তার বাড়ির ওদিকেরই কোন চোরা কারবারের পথ দিয়েই —এটাও আন্দাজ করে নিতে বেগ পেতে হল না তাকে। কাছাকাছি সব ঘাঁটিতে ওর নিজের বা জানাশোনা লোক। তাদের সতর্ক তো করে দিলই, ক্ষীরোদাদের ওদিকের ঘাঁটিতে ভারত সীমান্তে একটি বিচক্ষণ লোক মোতায়েন করে দিল। লোকটার নাম নুটবেহারী। এপার ওপারের কারবারে বামনদাসের একরকম দক্ষিণহস্ত। এরপর যখন বুঝল রঘু কাছাকাছি কোন পথে যায়নি পেরিয়ে, তখন ব্যবস্থাটা আরও পাকা করে দিল। আর চর পেছু নিয়ে পুলিশকে ধরিয়ে দেওয়া নয়। সোজা ওদিকের থানাতেই খবর দিয়ে দিল। বেশ সুনিশ্চিত হয়েই। সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যই, ব্যবস্থাটা আরও একটু পাকা করে নিল। নুটবেহারীকে সরিয়ে নিল একটা অপেক্ষাকৃত বড় কাজের অছিলে; ক'রে মিছামিছি পাঁচ হাজার টাকাটার অংশীদার হয় কেন? তিন মাসে রঘুর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথায় বড় বড় তামাটে চুল, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসে একটু একটু জট ধরতে শুরু হয়েছে। কতকটা অবহেলায়, কতকটা নিরাপত্তার জন্যেও। বিপন্ন পলাতকের পুরো লক্ষণ।

ধরাই পড়ত, বামনদাস টাকাটা একরকম জমার খাতায় তুলেছিল। কিন্তু বেঁচে গেল রঘু।

পাকিস্তানে অরাজকতা দিন দিন ঘনিয়ে উঠছে যা শেষকালে গণহত্যায় দাঁড়িয়ে গিয়ে পরিণামে পূর্বপাকিস্তানের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। আইন-কানুন ভেঙে যাচ্ছে, পাঞ্জাবী আর বালুচী সেপাইগুলো ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে, ইন্ধন জোগাচ্ছে রাজাকারের দল বাংলার বাইরেরই বেশি, তবে বাঙালীও নিতান্ত অল্প নয়। দেশপ্রেমী যুবকদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গেরিলা আন্দোলন দানা বাঁধছে।

দুদিনের পথ, সীমান্ত রেখাটাকে হিসাব রেখে খাড়া উত্তর দিকে। শরীর দুর্বল তার উপর একটানা হাঁটার ক্লান্তি, দ্বিতীয় দিনে বিকাল বেলায় একটা পুকুর ধারে এসে অশত্থের ছায়ায় হাতের ছোট্ট পুঁটুলি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রঘু, পাঁজরায় বেশ একটা খোঁচা খেয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল।

একটা পশ্চিমা পাকিস্তানী সেপাই-ই। প্রশ্ন করলে—'কৌন্ হায় ?'

একটু ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলো রঘু, এ পরিস্থিতিতে ঘুম ভাঙায়। তারপর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে উত্তরটা রপ্ত করা আছে, মোটামুটি কাজও দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান গৃহস্থ বা সাধারণ জিজ্ঞাসুর কাছে. সেইটাই বলল হাত দুটো একত্র করে—"সন্ন্যাসী হায় বাবা।"

'কাঁহা জায়গা ?"—আর একটা খোঁচা। তারপর ভীত বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সেপাইটা নিজেই বলল "বহিস্তমে ? চলো, সাথ আও।"

'বহিস্ত্' হোল স্বর্গ। সন্ন্যাসীই যখন, তখন গতিপথ আর লক্ষ্য কি বেশ ধরে নেওয়া যায়।

আর একটা খোঁচা খেয়ে রঘু উঠে দাঁড়াল। অনুসরণ করল লোকটার।

খানিকটা গিয়ে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাশাপাশি দুটো কানাৎ শামিয়ানা। সীমান্ত প্রহরীর একটা ছোট ঘাঁটি। একটা খালি, একটার মধ্যে জন-চারেক জড়ো হয়ে তাস খেলছে, একজন একটা খাটিয়ায় শুয়ে চিৎ হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। হালকাভাবে গল্পও হচ্ছে, এরা যখন পৌছাল তখন বালুচী-পাঞ্জাবীর একটা প্রচণ্ড হাসির জের,কিসব মন্তব্য টিপ্পনির মধ্যে মিলিয়ে আসছে।

ওদের দেখে একটু থমকে গিয়ে তাসের হাত থামিয়ে ঘুরে চাইল। খাটিয়ার লোকটাও বাঁশী থামিয়ে দিল। কৌতুহলটা অবশ্য রঘুকে নিয়ে ; প্রশ্ন হোল—'কে লোকটা, কোথায় পাওয়া গেল ?'

সেপাইটা জানাল—হিন্দু ফকির, স্বর্গে যেতে চায়, সিধা রাস্তায় পাঠাবার জন্য ধরে নিয়ে এসেছে।

একটা পৈশাচিক হাসি উঠল। বাঁশীওলা লোকটা রঘুকে প্রশ্ন করল—'জায়গা ?'

'সিধা রাস্তা যে কি বুঝতে দেরী হয় না। খুন-জখমের খবর প্রায়ই যাচ্ছে পাওয়া, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে এদের হাতে। রঘুর মুখটা শুকিয়ে গেছে। হাত জোড় করে একবার সবার দিকে চেয়ে নিয়ে ঐ লোকটাকেই বলল—'হাম তো কিছু কসুর নেই কিয়া বাবা স্রেফ্ আল্লাকা নাম লেতা।'

'ভগবান'-এর জায়গায় 'আল্লা' শব্দটাও কাজ দিয়ে থাকবে, তার চেয়েও বড় কথা হয়তো লোকগুলো হালকা অবসরবিনোদনের মেজাজে ছিল, একটু চুপ করে গেল। তারপর একজন অবোধ্য, হয়তো বালুচী ভাষায় কি একটা বলতে ওর চুল-দাড়ির দিকে চাইল সবাই। তারপর সবার মুখে একটু একটু হাসি ফুটতে ফুটতে একটা প্রচণ্ড জমাট হাসিতে কানাৎটা কেঁপে উঠল। হাসি হুল্লোড় হাততালির সঙ্গে কি সব এলোমেলো কথা নিজেদের ভেতর। তারই মধ্যে একজন রঘুর দিকে তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে বলল—'বহিস্ত্ পঁহুছ জায়গা।'

আকাশের দিকে ডান হাত সোজা তুলে দিয়ে বলার সঙ্গে হুল্লোড়টা দ্বিগুন হয়ে উঠল। বাঁশীওলা উঠে গিয়ে নিজের ন্যাপস্যাকের ভেতর থেকে খেউরি হওয়ার বাক্স বের করে একটা কাঁচি তুলে নিতে—"নেহি! নেহি!—অস্তরা, অস্তরা'—বলে একটা নাটকীয় কলরব উঠল, হাসির সঙ্গে। ক্ষুর বের হোল, রঘুকে বাগিয়ে ধরে দাড়িতে-চুলে জল মাখিয়ে নাচ—বাঁশী—হাততালি মেশানো প্রচণ্ড হুল্লোড়ের মধ্যে মাথা মুড়িয়ে গোঁফদাড়ি সাফ করে সবার উল্লসিত হাততালির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

সেপাইমার্কা কাঠরসিকতা, খুব তাগড়াগোছের একজন হালকা শোলার মতো করেই রঘুর পাঁজরা চেপে, তুলে ধরে—"বহুত হালকা হো গয়া!"—বলে দুবার শূন্যে নাচিয়ে দিতে হাসি-হুল্লোড়বাজি একেবারে কূল ছাড়িয়ে পড়ল। ঝোঁক ধরেছে, কাঠ-রসিকতা বাড়িয়ে একজন বিবস্ত্র করে আরও হালকা করবার জন্যে এগিয়েছে হাত বাড়িয়ে কি বলতে বলতে, এই সময় একজন অফিসারের পোশাকপরা লোক একটা ব্যাটন হাতে করে এসে উপস্থিত হতেই সবাই একেবার স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মিলিটারি স্যালুট করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"ক্যা হুয়া?"—গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল লোকটা। তারপর পায়ের কাছে চুলদাড়ির ওপর নজর পড়তে বোধহয় সাময়িক গাম্ভীর্য নষ্ট হওয়ার ভয়েই—

"যাও, নিকালো!"—বলে রঘুর পাঁজরার নীচে একটা ব্যাটনের ঘা দিয়ে এগিয়ে গেল রেঁাদের অফিসার।

শাপে বর হোল রঘুর।

ক্ষীরোদা একটা চিঠি দিয়েছিল। ওর স্তরেরই স্ত্রীলোককে। পেঁাছে তার সন্ধান নিয়ে বের করতে, তারপর তার সাহায্যেই সুযোগ বুঝে একটা দলের সঙ্গে সীমান্ত পেরুতে দিন আষ্টেক লেগে গেল।

সম্প্রতি, এও একটা সুবিধা হয়েছে। ওপারে পশ্চিমা পাকিস্তানীদের ধর পাকড়ের হামলা বাড়ায় আবার শরণার্থীর স্রোত আরম্ভ হয়েছে। ওরা পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী শূন্য করতে চায়। ভারত আশ্রয় না দিয়ে পারে না সুতরাং সীমান্ত-রেখার কোনও দিকে আর সে কড়াকড়ি নেই। বিশেষ করে উত্তর দিকে, যেখানে গণ্ডগোল একটু বেশী। তোড়জোড় করতে, একত্র হতে যে কটা দিন দেরী হল, তাতে সন্থ চুলদাড়ি নামিয়ে দেওয়ায় ভারটাও কেটে গিয়ে সন্দেহের সম্ভাবনাটা আরও গেল কমে। এপারে এসে পেঁাছাল রঘু।

॥ দশ ॥

পিঞ্জর যতই খারাপ হোক, তার একটা নিরাপত্তা আছে। যতদিন পাকিস্থানে ছিল, একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল রঘু। খায়দায়, বামনদাসের চেলাগিরি করবার তাগিদ বাড়লে স্বাধীন রোজগারের জন্যে দুএক দিন ঘুরে আসে। হাতের ঘুঁটি হাতে ধরে রাখবার জন্যে তাগিদ কমিয়ে দেয় বামনদাস। এরপর ক্ষীরোদা আছে। নেহাৎ মন্দ কাটছিল না রঘুর। পাকিস্থানের পিঞ্জরে ওর দিকে যারা চাইছে তারা অন্তত স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাইছে, ও-ও মুখ তুলে চাইছে তাদের দিকে।

এপারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এইটের অভাব হোল। এপারের জমিতে দুটো পা ভালো করে বসবার আগেই চোখ দুটো একবার ঘুরে এল চারদিক থেকে। বিচক্ষণ বলে যাকে মোতায়েন করেছিল বামনদাস, বেশি মেলামেশা না থাকলেও দেখালোক রঘুর। রঘুর অবশ্য চোখে ধুলো দিয়ে পঁচিশ মাইল উজিয়ে এসে পার হল সীমান্ত, কিন্তু যে এত বিচক্ষণ, এত বিশ্বাসের পাত্র বামনদাসের সে কি দু-চারটা ঘাঁটিতে সীমাবদ্ধ করে রাখবে নিজের সন্ধানী

দৃষ্টি। যে ভয়গুলো আগে মনে উদয় হয়নি, সেগুলোও এসে জুটল এপারে আসার সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল, ও যেমন যেমন ওপারে এগিয়েছে তেমনি তেমনি একজোড়া ভাঁটার মতো চোখ ওর উপর দৃষ্টি রেখে এপারেও এগিয়ে এসেছে। মাঝখানে কতটুকুই বা তফাৎ? এক এক জায়গায় রাস্তার এপার ওপার মাত্র। আধতোলা দৃষ্টি একবার সন্তর্পণে চারিদিকে বুলিয়ে এনে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রঘু।

আন্দাজটা ওর খুব বেশী ভুল হয়নি। ভয়ের বিকৃত কল্পনায় চিত্রটা ওর মনে যেভাবে ফুটে উঠেছিল, নুটবিহারীর এপার থেকে ওর উপর লক্ষ্য রেখে রেখে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসার, ঠিক এভাবে না হলেও অন্যভাবে ফলেই গেল সে আশঙ্কাটা। নুটবিহারী, যদি ওকে সরিয়ে দেওয়ার চালটা বুঝতে না পারত, তাহলে বামনদাসের 'দক্ষিণহস্ত' হতে পারত না। জেঁাকের ওপরও জেঁাক বসানো যায়।

সে যেমন বামনদাসের 'দক্ষিণহস্ত', তারও তেমনি দক্ষিণহস্ত আছে, তাকে যথাস্থানে নিযুক্ত করে সে একেবারেই ভেতরের খবরটা বের করে নিল, যা নাকি বামনদাসও পারে নি, অর্থাৎ কবে আন্দাজ ঠিক কোথা দিয়ে পার হবে রঘু। বামনদাস ওকে যে কাজটা দিয়েছিল, কাছাকাছি থেকে খুব একটা বড়-রকম স্মাগ্‌লিংয়ের পরিচালনা—দুদিনে খানিকটা তার জমি প্রস্তুত করে কলকাতায় একজন নিকট আত্মীয়ের অসুখের ছুতো করে ছুটি নিল নুটবিহারী। বামনদাস ভেতরে ভেতরে সুখীই হল, পাঁচ হাজারের ব্যাপারটা থেকে যতদূরে থাকে ততই মঙ্গল। বলল—তেমন দ্যাখে তো ওর তাড়াতাড়ি ক'রে ফেরবার দরকার নেই। শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি চলছে। নুটবিহারী একটা চিঠি লিখে কলকাতা থেকে সেটা ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করল—আত্মীয়ের অবস্থা খারাপ, কিছু দেরি হবে তার কাজে ফিরতে। ঠিকানাও দিয়ে দিল চিঠিতে, যদি তেমনি প্রয়োজন হয় তো ডেকে নেওয়ার জন্যে। বামনদাস ওকে সাংকেতিক ভাষায় জানাল—কুছ পরোয়া নেই, যতদিন দরকার থাকুক কলকাতা। ও এদিকে সামলে নিচ্ছে স্ম্যাগ্‌লিংয়ের কাজ। এ চিঠি ডেড-লেটার অফিসে জমা হল। রঘু যেদিন সীমান্ত পেরুল, তার দিন-পাঁচেক আগেই নুটবিহারী এসে ঘাটিতে উপস্থিত হয়েছে, পুলিশকেও সতর্ক করে রেখেছে। কিন্তু এসে পর্যন্ত রুক্ষ, লম্বা চুলদাড়ি, আলুথালু বেশ কোনও লোককেই দেখিয়ে দিতে পারল না।

বিপদে বুদ্ধি বাড়ে। ওপারে যে-কটা দিন দেরি হল, তাতে আরও খানিকটা আত্মগোপনের উপায় বের করে নিল রঘু। একটি বৃদ্ধা, তার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একটি মাস আষ্টেকের নাতনী আগলে রয়েছে। একবার ওপারটা দেখে আসতে চায়। রঘু তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নিল, সাহায্য করবে বৃদ্ধাকে খোঁজ নিতে। সে শুধু যখন তাকে কিছু বলবে, তখন 'টুকুন' বলে তার ছেলের আদুরে নাম ধরে বলবে। দরকার হলে সেখানে পরিচয়ও দেবে ছেলে বলে। বলবে পুত্র-বধূটি পশ্চিমা পাকিস্তানীদের হাতে পড়াতে ছেলে বিকৃতমস্তিষ্ক আর একরকম বোবা হয়ে যাওয়ায় চলে এসেছে হিন্দুস্থানে। পুত্রবধূটি আসলে কিন্তু সূতিকাগারেই মারা যায়। বুদ্ধি বিপদে পড়ে ভালোভাবেই খুলছে রঘুর। বোকা কখনও ছিল না, অবস্থা গতিকে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। বেশ একটি কাহিনী সাজিয়ে নিল বিশ্বাস আর সহানুভূতি জাগাবার মতো করে। পরিচয় হওয়ার পর থেকে বুড়ির বাড়িতে দিনতিনেক থেকে বেশ সড়গড় করে নিল ব্যাপারটা। খানিকটা অভিনয়ের রিহার্সেল দেওয়াগোছের করেই।

জনকুড়ির একটা মিশ্র দলে ওরা যখন সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এল, হাঁটু পর্যন্ত ডোবে এইরকম ঝিরঝিরে একটি সংকীর্ণ নদী পেরিয়ে, তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। রঘুর বুকে শিশুকন্যাটি বাঁহাতে জড়ানো, ডান হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সীমান্ত পুলিশের কাছে একে একে পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সবাই; একটা ক্যাম্পগোছের করা হয়েছে, তাতে লোকও রয়েছে। প্রায় মাঝামাঝি রঘু আর বুড়িটার পালা এল। রঘুকেই প্রশ্ন, কিন্তু সে বোবা হয়ে যাওয়ার ভান করবে কি, একটা দৃশ্যে একরকম হয়েই গেছে বোবা। সীমান্ত প্রহরী আর ক্যাম্পের লোক ছাড়া কিছুটা তফাতে দর্শনার্থীদের একটা ছোটখাট ভিড়, কিছু এমনও রয়েছে যারা কোন কোন শরণার্থীর আত্মীয়, নিয়ে যেতে এসেছে, তার মধ্যে থেকে একজোড়া ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ সন্ধানী আলোর মতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছে সবার ওপরে। আধতোলা চোখ অবাধ্যভাবেই কয়েকবার গিয়ে পড়ল রঘুর, ঘাড়টা গুঁজে রাখবার চেষ্টা করেও উঠে উঠে পড়ল কয়েকবার আতঙ্কের সম্মোহনে। পুরুষ হিসাবে পরিচয় প্রশ্ন তাকেই, কিন্তু কোনও রকম বাক্‌স্ফূর্তি না হয়ে শিশুটিকে বুকে চেপে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল সীমান্ত প্রহরীর দিকে। নিখুঁত অভিনয় করল বুড়ি। অভিনয়ই কেন বলা, তার সমস্ত ট্রাজেডিটাই

তো এসে জড়ো হয়েছে এই একটা মুহূর্তে। একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠে বুক চাপড়ে বলল—ও পাগলকে আর কি জিগুবা বাপধন ? বউ-বেটি গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়া কি বাকি্য কইরা জানাবার মতন আছে ?···ওরে আমার সোনার প্রিতিমে রে !···'

ক্যাম্পের লোকেরা এগিয়ে এসে ওদের একটু বিশেষ হেফাজৎ করেই নিয়ে গেল।

গভীর রাত্রে শ্রান্ত হয়ে সবাই যখন একেবারে নিঃঝুম, রঘু সন্তর্পণে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

॥ এগারো ॥

সমস্ত রাত হেঁটেছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো, শুধু একটি সংকল্প নিয়ে, সীমান্ত ঘাঁটি থেকে কতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, ক্রমে চোখ খানিকটা সয়ে এলে গতিবেগও যতটা পারল বাড়িয়ে দিল। ক্লান্তিতে পা একটু ধরে এলে শক্তি জোগাচ্ছে হুটবিহারীর ভাঁটার মত চোখ দুটো। মনে হচ্ছে পেছনে, কখনও কাছে, কখনও দূরে থেকে তাদের সন্ধানী দৃষ্টি পিঠের ওপর এসে আটকে রয়েছে। এগিয়ে যেতে যেতে এক একবার ঘুরেই দেখছে। চলার বিরাম নেই। শুধু কোন্ দিক যাচ্ছে তার কোনও হুঁস নেই। প্রথমেই একটা চওড়া পাকা সড়কের উপর উঠেছিল, সীমান্তের সমান্তরালের রাস্তাগুলো যেমন হয় সামরিক উদ্দেশ্যে। ওটা উত্তর-দক্ষিণে। খানিকটা গিয়ে কিন্তু রাস্তাটাকে বিশ্বাস হল না। প্রথমেই তা থেকে যে শাখাটা বেরিয়েছে, একটা কাঁচা নীচু রাস্তা, তাইতে নেমে পড়ল। এরপর বেশ কিছুটা গিয়ে এর থেকে বেরুনো আর একটায়, তারপর আরও একটার মাথায় ঢুকেছে, যত সম্ভব ঘুর প্যাঁচের পথ ধরে ফাঁকি দেবে সীমান্ত পুলিশ আর হুটবিহারীকে। তার সঙ্গে বামনদাসকেও ; সে কি এত কাঁচা যে, হুটবিহারীর হাতে ছেড়ে দিয়ে সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে ? নিজেও নেমেছে নিশ্চয়। হুটবিহারীর চোখ দুটো আগুনের গোলকের মতন যেমন স্পষ্ট, বামনদাসের কুৎকুতে ছোট ছোট চোখ দুটো কোটরের মধ্যে তেমনি প্রচ্ছন্ন। আরও প্রচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে নজর রেখে যাচ্ছে কে জানে ?

প্রায় বারোটার কাছাকাছি ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে রঘু। যখন

ফুটবিহারীর সঙ্গে মনে মনে রেস দিয়ে প্রায় ঘণ্টা চারেক হেঁটেছে, তখন শরীরে আর শক্তি নেই। তখন রেসে জেতার সংকল্পটাও সরে গিয়ে, নিরুপায়ের আত্মসমর্পণের ভাবটাও এসে পড়েছে। মরিয়া, যা হবার হোক এবার। দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দেখল রঘু। শুধু চকিতে দেখে নেওয়া নয়, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারে চোখ ঠেলে ঠেলে দেখল। না, কেউ নেই। ফুটবিহারী সীমান্ত পুলিশ, বামনদাস—কেউ নয়। আসে কেউ, বলবে—'এই নাও, ধরো।' আর পা উঠছে না।

একটা মাঠের সামনে এসে পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা শেষ হয়েছে। বসেই পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ গভীর অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেদ করে তীরের মতই একটা তীক্ষ্ণ শব্দ।

চকিত হয়ে উঠল রঘু। সমস্ত দেহমন আলোড়িত করে হঠাৎ একটা উল্লাস যাতে দুঃস্বপ্নের মতো এতক্ষণের অলীক আতঙ্কটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে পায়ে যেন অসুরের শক্তি ফিরে এল। স্টেশন! রেলইঞ্জিনের বাঁশী। হয়তো একটা গাড়ি এসে প্রবেশ করল স্টেশনে।…নিষ্কৃতি!

ছুটল রঘু। ফসলতোলা এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ে-উঠে যখন কাছাকাছি হয়েছে স্টেশনের গাড়িটা ছেড়ে দিল। খুব নিরাশ হতে হল না কিন্তু মালগাড়ি ছিল একটা।

প্ল্যাটফরমে উঠে একবার পেছনে চেয়ে দেখল। না, কেউ নেই। রেল-স্টেশন পলাতকের সিংহদ্বার, মস্তবড় ভরসা, একবার গাড়িতে চড়ে বসতে পারলে মুক্তি, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। কিছু দিন. কিছু মাস, কিছু বৎসরও হতে পারে। আজীবনও। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, শেষের দিকের এই উদ্বেগ আর পরিশ্রমে। তবে একটা ভরসা এসে গেছে মনে, সেটাকে পুষ্ট করল পূব দিগন্তের আকাশ, প্রত্যুষের প্রথম আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে।

একটা কুলি আসছিল। বোধহয় এই গাড়িতে কিছু মাল বোঝাই করে। স্টেশনের নামটা জিজ্ঞেস করতে বলল লোকটা। কিন্তু কিছু বুঝল না রঘু। এদিকে যতায়াত কম, কিছু নূতন স্টেশন খোলবার কথাও শুনেছিল।

প্রশ্ন করল—গাড়ি কটায় পাব?'

"কোথাকার?" একটু হকচকিয়ে গেল রঘু। আমতা আমতা করেই বলল—এই ধরো…ধরো কলকাতার।

একটু চেয়ে থেকে লোকটা বিড় বিড় করে নিজের মনে বলল—'বাউড়্া!' অর্থাৎ পাগল নিশ্চয়। ওকে বলল—'ফাস্টো ট্রেন।'

চলেই যাচ্ছিল, একটু যেন বিরক্ত হয়েই, 'শোন'—বলে দাঁড় করাল রঘু। একটা প্রশ্ন যেন ঠোঁট পর্যন্ত এসে হঠাৎ আটকে গেল, মুখ থেকে বের করতেই যেন সাহস হচ্ছে না। একটা যে সেকেণ্ড কয়েকের বিরতি এসে গেল তাতে লোকটা স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে বলল—"কি কথা বল, না ক্যাবলই···"

"বলছিলাম পাকিস্তান এখান থেকে কতটা হবে·· মানে পেরুবার ঘাঁটিটা আর কি ?"

"ঐতো দেখা যায়, মাইল-তিনেকও হবে না।"

আর অপেক্ষা না করে চলে গেল লোকটা।

রঘু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। দৃষ্টিটা পূব দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সম্মোহিত হয়েই ফেরাতে পারছে না। তাহলে অর্ধেক রাত ঐভাবে চলে শুধু এতটুকু আসতে পেরেছে! 'নিশীতে পাওয়া'র মতো ক্রমাগত শুধু পথ আর দিক বদলে বদলে! কতবার তাহলে সীমান্ত-ঘাঁটির কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে কে বলবে? আর তো কোলে বুড়ির নাতনীটাও ছিল না আত্মগোপনের সহায়তা করত!

ঝনঝন করে ঘণ্টা বেজে উঠতে চটক ভাঙল। আগের স্টেশন বা তার আগের স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়লে ঘণ্টা দেওয়ার একটা ঢিলেঢালা রেওয়াজ আছে। খালাসির ওপর নির্ভর, কখনও পালিত হয় কখনও হয় না।

স্টেশন পেয়ে যাওয়া নিতান্তই আকস্মিক, এত শীঘ্র পাবে আশা ছিল না। দৌড়ে আসতে আসতেই ঠিক করে নিয়েছিল, গিয়েই গাড়িতে চেপে বসবে, তা সে যে দিকের গাড়িই হোক, টিকিট না করেই—করার সময় যে পাবে তার সম্ভাবনা ছিলই না। তাই কুলিটাকে তখন ঐভাবের প্রশ্নটা করে—গাড়ি কখন পাবে। ও যে সীমান্তের এত কাছাকাছি, কুলির কাছে শোনার পর এই যে-কোনও গাড়ির সংকল্পটা আরও দৃঢ়ই হয়েছে। তবে সময় রয়েছে, টিকিট করবে; আরও বিপদের ওপর বিপদ ডেকে না এনে।

একটু মুশকিল হোল আবার। কলকাতার গাড়ির কথাই জিজ্ঞেস করেছিল আলতোভাবে, এ গাড়িটা আবার কোনদিক থেকে আসছে জানতে হয় টিকিট কেনবার জন্যেই।

কথা বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভয় করছে প্রশ্ন করতে। একটু

প্রসন্ন থাকবার জন্যেই প্লাটফরমের শেষের দিকে ছিল দাঁড়িয়ে। এগিয়ে আসতে আর একটা বাধা। খুব ভোর হলেও টিকিটঘরের সামনে পাঁচ সাতজন লোক জমেছে, আরও জমছেও।

মানুষের সামনে হবে কি ক'রে রঘু? ঘুটবিহারীর ভয়টা আবার চাগিয়ে উঠল, নিজে না থাকে চর লাগাতে কতক্ষণ? সীমান্ত ঘাঁটির এত কাছে স্টেশন।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খালাসিটাকে আবার ওদিক থেকে আসতে দেখে ডাকল—'শোন তো একটু।'

এলে বলল—"ইয়ে এটা তো কলকাতার গাড়ীই আসছে, ঘণ্টা যে হল?"

"আর কোথাকার হবে?...তুমি যাবা কমনে"—বাজে বকা ভাল লাগছে না লোকটার।

...ঐ কলকাতায়ই—তখন বললাম না তোমায়? তা, ভাড়া কত তাই জিজ্ঞেস করছি?'

কথায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করছে রঘু। লোকটা ভাড়াটা জানাতে ট্যাঁকের গেঁজেটা বের করে দুটো দু'টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলল—একটা টিকিট নিয়ে আসতে পারবে?...যা ফিরবে তা আর দিতে হবে না আমায়।

ভোর-সকালে বেশ ভাল সওদা। না বললেও কিছু হাতিয়ে নিতই ভুজুংভাজুং দিয়ে, আজকাল শরণার্থী বাড়ায় এ ধরনের খদ্দের পাচ্ছেও দু-চারটে করে। তবু মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে নিছক কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করল—"কেন, তোমার নিজের যেতে কি হল?"

"তুমি দাওনা এনে ভাই।...ইয়ে, আমার কেমন আসে না টিকিট-ফিকিট কেনা, নিজের দুর্বলতায় একটু হাসবার চেষ্টা করল।

অবিশ্বাস করল না লোকটা। ওপারে সব খুইয়ে এরকম বিকৃতমস্তিষ্ক লোকও তো কম দেখছে না রোজ। বলল—"আমি আসছি।...তুমি এখেনেই থেকো দাঁড়িয়ে।"

॥ বারো ॥

কলকাতায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রঘু। পাকিস্তানের বামনদাসের আড্ডা ছাড়ার পর এই প্রথম মুক্তির স্বাদ। শেয়ালদার প্লাটফরমে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

ওর যে ধরনের বিপদ তাতে মানুষ অরণ্য খোঁজে, না প্রাকৃতিক অরণ্য তো জনারণ্যই, সেটা পেল। ওদের গাড়িটা যাত্রী সংগ্রহ করতে করতে বেশ বোঝাই হয়ে এসেছে। লোকাল গাড়ী। কিছুক্ষণ পরেই ছেড়েও যাবে। লোক জুটছে। রঘু নেমে কতকটা ইচ্ছা করেই নিজেকে হারিয়ে দিল ভিড়ের মধ্যে। বেরিয়ে এসে একটা ভদ্র-গেছেরই হোটেল খুঁজে নিয়ে একটা এক সীটের খালি ঘর ভাড়া করে নিল একদিনের জন্য দোতলাতে। শরীর ক্লান্ত আর বইছে না, তবে, মনটা খানিকটা তাজা হয়ে উঠেছে, করুণাপরবশই হয়ে উঠেছে নিজের উৎপীড়িত দেহের উপর। খরচের কথা ভাবল না। বেশ তৃপ্তি করে স্নানাহার করে দুয়ার এঁটে বেশ ভালো করে বিশ্রাম করে নিল। যখন উঠল, দুপুর পেরিয়ে খানিকটা বেলা হয়েছে। নীচে গিয়ে হোটেলের আপিস ঘরের ঘড়িতে দেখল, প্রায় তিনটে। বেরিয়ে গিয়ে কাছের একটা দোকান থেকে একটা তালা কিনে নিল। এটাও ভালই কিনল। অনেকটা মন্দ কেনার অভ্যাস নেই বলেই। তাছাড়া, ভবিষ্যৎটা যেন একটা দিনেই একটু স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, কাজে লাগতে পারে। হোটেলে ফিরে এসে ঘরে তালা এঁটে বেরিয়ে পড়ল।

ঘুরে ঘুরে একটা পাঁচ মিশেলি বস্তি বের করল রঘু—কুলি, মজুর ঠিকে ঝি সস্তা ফেরিওলা দর্জি, সেলুন, চা-স্টল, অল্প ভাড়া দিতে সমর্থ—এই ধরনের কিছু শরণার্থীও। দুটো খোলার ঘর নিয়ে একটা ছোট বাসা পেতে অসুবিধা হল না—একটু ভেতরের দিকে, যা বরং ও চায়ই। এক মাসের আগাম ভাড়া বায়না দিয়ে, হোটেলে ফিরে এসে ব্যাগের মধ্যে তালাটা আর শুকুতে দেওয়া ধুতি-গামছা পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঘু।

বেশী দূরে নয়। শেয়ালদার খিড়কিটা এক রকম বলতে গেলে বস্তিরই জায়গা, সন্ধ্যার বেশ খানিকটা আগেই গেল পেঁাছে। তখনই গৃহস্থালী এক রকম গুছিয়েও নিল। গড়ান কাঠের একটা চৌকি ভাড়াই পাওয়া গেল।

বাসায় তালা দিয়ে আবার বেরিয়ে গিয়ে ফুটপাতেই জড়োকরা গাঁদি থেকে একটা সস্তা চাদর কিনল, ছোট রেডিমেড্ বিছানার দোকান থেকে একটা বালিস কিনল। একটু ভেবে, আর বেশি হিসাবের দিকে না গিয়ে একটা সস্তা ছোট জালি মশারিও কিনে ফেলল, সাড়ে তিন টাকা দিয়ে। একটা সস্তা সতরঞ্চীও। বেরিয়ে এসে একটা জলের কুঁজো, এনামেলের গেলাস, মোমবাতি, দেশলাই, আরও সন্ত প্রয়োজনের কিছু টুকিটাকি কিনে ফিরে এল রঘু। গেল কতকগুলো টাকা, যখন মাটিতেই মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকবার মতো অবস্থা। তবে, জনারণ্যের মধ্যে মুক্তিতে একটা চাপা উল্লাস ঠেলে উঠেছে। গ্রামের বিশিষ্ট জোৎদার 'হলধরের ছেলে রঘুর মনের কথায় যেন উঁকি মারছে, যে হিসাব করে খরচ করতে শেখেনি কখনও।

বস্তিতে ফিরে আসতে সন্ধ্যা উতরে গেল। বস্তিরও সদর রাস্তা থাকে। দু'-চারটে বিজলিবাতি, ডাস্টবিন, পালার বালতি-কলসী সাজানো জলের কল, টিউবওয়েল, মেয়েদের ভিড়। কলের সামনে একটা ছোট ছেলে কিসের প্রতীক্ষায় যেন ভীরু দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিখারীই মনে হয়। কোমরে ওর চেয়ে ছ-সাত বছরের বড় কারুর একটা ময়লা প্যান্ট। কি মনে হ'তে দাঁড়িয়ে পড়ল রঘু, প্রশ্ন করল "তোর কি ?"

"জল খাব একটু।"—ডান হাতের আঙুলগুলা ঠোঁটের কাছে জড়ো ক'রে দেখাল।

"তবেই হয়েছে!"

শেষে টুকিটাকি সব কিনে খুচরা-পয়সাগুলো এনামেলের গেলাসটার মধ্যে রেখে দিয়েছিল, আর গেঁজেটা না বের করে, ঘুরে একটা চিড়ে মুড়কির দোকানে নজর পড়তে বলল—"ঐখেনে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে নিস।...নে।"

গেলাসটা উল্টে দিল হাতে, খুচরা পয়সায় আনাপাঁচেক বেঁচেছিল। কলতলার মেয়েদের মধ্যে একটা টেপা হাসি উঠলো। একজন টেপা হাসি দিয়েই মন্তব্য করল—'ওরে ব্বাসরে! দাতা কর্ণ।'

না ফিরে এগিয়ে গেল রঘু। হলধরের ছেলে।

রান্নার-হাঙ্গামাটা নেই, সেটুকু আগেই জানতে পেরেছিল। বস্তিতে হোটেল আছে। কি রকম আজ রাত্তিরে গিয়ে দেখবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

এ দিকের গৃহস্থালীর সব গুছিয়ে নিল। নামটা বামনদাসের আড্ডা ছাড়বার পর থেকেই বদলে সতীশ করে নিয়েছিল। সেই নামই চলল।

বস্তিতে বেশ ভালই কাটতে লাগল। একটা স্বস্তি, নিশ্চিন্ততা। গোড়ায় মাঝে মাঝে পাকিস্তান থেকে চলে আসার সেই তীব্র আশংকার দিনগুলা জেগে জেগে উঠতো। বিশেষ করে এপারে এসে। ভিড়ের মধ্যেও মুট-বিহারীর ভাঁটার মত চোখজোড়া বা বামনদাসের কোটরগত চোখ খুঁজত রঘু, কিংবা চঞ্চল ট্রাফিক ভিড়ের মধ্যে অন্য কারুর চোখই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কিনা তার দিকে। এ্যাক্‌সিডেণ্টের হাত থেকে বেঁচে গেল ক'বার, কাল্পনিক ভয়ে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু আর কিছুই না দেখায় আস্তে আস্তে ও ভাবটা কেটে গিয়ে জীবনটা সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে এল।

স্বচ্ছন্দ হয়ে এল অন্য দিক দিয়েও।

বাড়িটার মালিক একটি স্ত্রীলোক। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে, মোটা-সোটা কর্মঠ, আর বেশ হাসিখুশি মেলামেশার ভাব। বস্তিতেই আরও দুটি বাড়ি আছে। একটা ভাড়া খাটে, রঘুর বাসা থেকে একটু বড়। একটা ওরই মতো তাতে নিজে থাকে। নাম মানদা দাসী। থাকে একাই।

খোঁজ-খবর নেয় কখনও কখনও এসে। রঘু আসার তৃতীয় দিনে, হোটেলে খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে, নিজেই ব্যবস্থা করতে চায় শুনে শিউরে উঠল। খোঁজখবর নিচ্ছে বলেই একটা সম্বন্ধ ধরে ডাকবার জন্যে 'মাসি' বলে ডাকছিল রঘু, শিউরে উঠে বলল—"বেটাছেলে হাত পুড়িয়ে খাবে। মাসি তাহলে রয়েছে কি করতে বাবা? নিজের তো কোন হ্যাপা রাখেন নি ঠাকুর। মাসিই এসে দুবেলা দু-মুঠো না হয় ফুটিয়ে দিয়ে গেলুম।"

সেই ব্যবস্থাই চলল। ক্রমে সংক্ষিপ্ত গৃহস্থালীর ঝাড়ামোছা যেটুকু কাজ তাও মানদা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওদিক থেকেও নিশ্চিন্ত করে দিল রঘুকে।

মানদা দাসীও যে ক্ষীরোদা স্তরের স্ত্রীলোক, বয়স গিয়ে মাসির পদবীতে উঠে এসেছে, এটা বুঝতে দেরী হয়নি রঘুর, গোড়াতে বুঝে গিয়েই সম্বন্ধটা পাতিয়েও ছিল ঐভাবে। ধীরে ধীরে এই অনুপ্রবেশে আপত্তি করল না, অনেকটা এই ধরনের জীবনে অভ্যস্তও তো হয়ে আসছিল, বিশেষ করে দুর্ঘটনাটার পর পকিস্তানে উঠে যাওয়া থেকে। নিশ্চিন্ত আরামে বেশ ভালোই কাটতে লাগল। বস্তিরও একটা সমাজ আছে, কিন্তু সে-সমাজের একটা সুবিধা, লজ্জা বা ভয়ের স্থান নেই সেখানে। সে দিকেও নিশ্চিন্ত।

প্রায় মাস দুই কেটে গেল।

এর মধ্যে আর একটু গুছিয়ে নিয়েছে রঘু। নিজের যেটুকু সংস্থান ছিল, তার উপর ক্ষীরোদার কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছিল, ভাঁটিয়ে আসছে, দুটি গয়নার একটি গেছে, একটির ওপর হাত পড়বে, এই সময় প্রায় মাস দেড়েকের মাথায় একটা ভদ্রগোছের হোটেলে চাকরি পেয়ে গেল।

জীবনটা নীচের দিকে গড়িয়ে চলেছে জোৎদার হলধরের ছেলে রঘুর। কিন্তু ভালো আছে, সে সব তো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছেও গেছে জীবন থেকে। একটু যে খোঁজ নেবে সেখানে কি হচ্ছে, সেকথা তো ভাবতেও হৃদ্‌কম্প হয়। এরপর আরও নীচের দিকে যাবার উপক্রম হল।

॥ তেরো ॥

ওপরে-ওপরে কতকটা ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা সকরুণ সহানুভূতির ভাব রেখে গেলেও মানদা দাসীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল রঘুর ওপর। বিশ্বাস করেছে পাকিস্তানে সব খুইয়ে রিক্ত হয়েই এসেছে রঘু। কথাটা একদিক দিয়ে তো সত্যও। এ-ও বিশ্বাস করেছে, চেয়ে চিন্তেই চালাচ্ছে। চাকরি হওয়ার পর কিন্তু পরিবর্তনটা ধরতে ওর বিলম্ব হলনা, এবং রঘু গোপন করে গেলেও একদিন কথাটা বের করে নিতে অসুবিধা হল না।

কিছুদিন যেতে দিল মানদা।

তারপর অনেক দিন থেকে মনে মনে যে কথাটা এঁচে আসছিল, একদিন সেটা তুলল ওর কাছে।

তার জমিও আগে থাকতে একটু তোয়ের করে রেখেছিল। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছুতা করে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঘরঝাড়া, রান্নার কাজ, এই সব করাল তাকে দিয়ে, নিজে এক জায়গায় কপাল টিপে বসে থেকে। চাকরির কথাটা বের করে নেওয়ার পর বেশ সময় দিয়ে একদিন বলল—এরকম বাউণ্ডুলের মতো না থেকে আবার সংসার পাতুক না—সবাই তো করছে তাই—কে আর হা-হুতাশ করে বসে আছে? ওর একটি ভাইঝি আছে—যেটি এসে দুদিন সামলে দিয়ে গেল—মা নেই, বাপ দেখে না—রঘু রাজি হয় তো পাড়ে কথা।...ভেবে দেখুক না রঘু।

কথাটা হজম করতে দিয়ে আবার অন্যদিন তুলল।—যদি থাকে রাজি রঘু তো, মানদাও নিজের থাকার বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে আসে—নিজের ভাইঝিই

তো—থাকে সবাই এক সঙ্গে—একটা আয় বাড়েও—কেন হোটেলে-ফোটেলে কাজ করবে রঘু—নিজেদের কিছু একটা ফেঁদে—এমন কি বস্তি থেকেও উঠে গিয়ে ভদ্রভাবেই থাকা যায়।—রঘু যে এখানে পড়ে থাকবার মতো নয় সেটা তো দেখেই বুঝেছে মানদা। আর মানদারই কি এই সব নোংরামির মধ্যে কাটাবার কথা?…সে এক আলাদা কাহিনী, শোনাবে একদিন রঘুকে।

ভবিষ্যতের বেশ একটি রঙ্গীন, লোভনীয় চিত্র তুলে ধরল ওর সামনে।

পোড়-খাওয়া ছেলে রঘু, সবটুকু যে বিশ্বাসই করল এমন নয়। ভাইঝি হতে পারে, না-ও হতে পারে, অন্য কারুর উটকো মেয়ে, তেমনি আবার নিজের মেয়েও হতে পারে, অন্য জায়গায় বনছে না, সরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু মন্দটা কি? এই ধরনের জীবনেই তো অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল পাকিস্তানে বাড়ি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে। এ যা বলছে মানদা দাসী, তাতে সেই জীবনই আরও খানিকটা গুছিয়ে গাছিয়ে নেওয়া, এমন কি খানিকটা ভদ্র করে নেওয়াও। স্ত্রী, নিজে, শাশুড়ি; অন্য জায়গায় উঠে গিয়ে এই পরিচয়েই নূতন জীবন।

লোভ হল, নেমেও যেত রঘু এক ধাপ, ঠিক এই সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা এসে পড়ে ওর জীবনের গতি অন্যদিকে মোড় দিল।

হোটেলের যেমন স্থায়ী-অস্থায়ী বাসিন্দা আছে, তেমনি একটা রেস্তরাঁ বিভাগও আছে, খদ্দেররা নগদ খেয়ে যায়। রঘুর, চাকরি এই বিভাগে। ওয়েটার, তবে খানিকটা হেড ওয়েটারের মতো। বাকি ওয়েটারগুলো ছেলেছোকরাই। বেশ মাঝারি গোছে একটা হলঘর, বিকালে-সন্ধ্যায় যখন চাপ বেশি থাকে কাজের, ওর প্রধান কাজ থাকে নজর রাখা, তদারক করা।

সেদিন এগিয়ে যাচ্ছে দুপাশের দুসারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে, ফরমাস অনুযায়ী ছোকরা ওয়েটারদের ডেকে বলে দিতে দিতে, একটা টেবিলে একজন খদ্দের 'একটা চপ দিতে আর...'—বলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গিয়ে বলে উঠল—'রঘু না?'

'ভুল করেছেন আপনি, আমার নাম সতীশ্।'—একটু হেসে বলে, ওরই মধ্যে চোখের একটা খুব সূক্ষ্ম ইসারা করে এগিয়ে গেল রঘু—বাবু কি চান, সামনের একটি ছোকরাকে দেখতে বলে। ভাবটা দেখাল, যেন সামনে একটা কি হঠাৎ দরকার পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হল ঘরটার পাশে একটা ছোট ঘরে ঢুকে একটা

চেয়ারে বসে পড়ল রঘু। হৃদ্‌পিণ্ডটা পাঁজরার মধ্যে যেন আছাড় খাচ্ছে। নাম ধরে ডাকল ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু বেচারাম।

একটা উৎকট কৌতূহল দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল—গ্রামের কি খবর এই ক'মাসে তা বেচারামই দেবে। চোখ টিপে দিল। সে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য, দু-পা এগুতে না এগুতেই সে কৌতূহল ঠেলে একটা আতঙ্ক এসে সারা মনটা জুড়ে বসল, চেয়ারে বসে হাঁফাতে লাগল রঘু।...বেচারামই যে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে তার আবির্ভাব, সব জায়গা ছেড়ে ঠিক রঘু যে-হোটেলটিতে কাজ করছে সেখানে? খুবই আশ্চর্য। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। এই ছিল গাঁয়ে, অনেক কুকীর্তির সহচর, বিশ্বাসী বন্ধু।

কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা যে অন্তরঙ্গতার মধ্যেও কী বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে তাও তো দেখল। বামনদাসও কি কম আপনার হয়ে পড়েছিল? বেচারাম আবার রঘু সরে আসায় অর্থের দিক দিয়েও বিপন্ন হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। ওর লক্ষ্মী ছিল রঘুর লক্ষ্মীছাড়াপনার মধ্যে। বেরিয়ে পড়েছে, পেয়েছে দেখা, এবার ধরিয়ে দেবে।

ঘরটা রেস্তর্াঁর কাঁচামালের ভাঁড়ার গোছের, ময়দা—দালদা—চিনি এইসব, একরকম নির্জন।

একবার উঠে দরজার চৌকাঠ থেকেই উঁকি মেরে দেখে এল রঘু। বেচারামের মুখ উলটো দিকেই। খাচ্ছে, যেন সময় নেবার জন্যে, আরও বেশ কিছু চেয়ে নিয়েছে, নৈলে এত দেরী হওয়ার কথা তো নয়।

আস্তে আস্তে এসে আবার বসে পড়ল। কপালে ঘাম জমে উঠেছে। ভয়, সেই ধরনের ভয়, যাতে মরিয়া হয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়।...আর এভাবে পারছে না। যা হবার হয়ে যাক্।

আরও একটা আশঙ্কা ওকে সংকল্পে দৃঢ় করে তুলল—এখনি যে-কোনও মুহূর্তে হোটেলে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে—একটা রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ফেরারী আসামী ধরা পড়েছে, নিজের স্ত্রীকে হত্যা—ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার পাঁচ হাজার—বন্ধুই ধরিয়ে দিচ্ছে ..পুলিস,...গ্রেপ্তার...

যতটা পারল নিজের মনটা গুছিয়ে নিল রঘু। পদক্ষেপ দৃঢ়, সহজ করে নিয়ে পেছন দিক থেকে গিয়ে বেচারামের টেবিলের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"আপনি তখন কি যেন চাইছিলেন—ওদিকে ডাক পড়ায় চলে যেতে হল আমায়—পেয়েছেন?"

বেশ সহজ গলায় অনেকখানি কথা, তার মধ্যে চোখের ইশারা বেশ ভাল ভাবেই করে দিল, ওদের পরিচিত ইসারা। চার সীটের টেবিল, মাত্র আর একজন খদ্দের, রঘুর দিকে পেছন করে খাচ্ছে।

বেচারাম বলল—"হ্যাঁ, একটা কাটলেট চেয়েছিলাম, এই হয়েও গেছে। বিলটা দেরে?"

"পাঠিয়ে দিচ্ছি বয়কে।" কাউণ্টারে ম্যানেজারকে গিয়ে বলল—

—"হঠাৎ গা'টা কেমন গুলিয়ে উঠল, ছুটি দিন বাকি সময়টুকুর জন্যে।"

টাউয়েল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছল।

ছুটি নিয়ে ওয়েটারের ড্রেস ছেড়ে হোটেলের দরজা থেকে নেমে পাশেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই বেচারাম বেরিয়ে এলে সঙ্গে করে নিয়ে বলল—"চল, পার্কটায় গিয়ে বসি।"

খানিকটা পথ, কিন্তু মাঝে কোনও কথা হল না। একটু এগিয়ে একটু নিরিবিলি দেখেই বেচারাম কি বলতে যাবে, রঘু ছোট্ট করে বলল—"চুপ।" হাতটাও একটু টিপে দিল।

পার্কে গিয়ে, অন্য প্রান্তে একটা একেবারে নির্জন জায়গায় গিয়ে বসল দুজনে, কাছে-পিঠে কোথাও একটা বেঞ্চও নেই যে কেউ এসে বসবে। মুখ বুজেই বসল দুজনে, তারপর রঘু নিজের একটা কব্জির ওপর আর একটা কব্জি পেতে দিয়ে বলল —"দে ধরিয়ে বেচু, আর সহ্য করতে পারছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা গুঁজড়ে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল।

বেচারাম কিছু বলল না, কাঁদতেই দিল নীরবে, শুধু সরে একটু পাশ ঘেঁষে বসে পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলুতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ গেলে বলল—"বুঝেছি—পাঁচ হাজার টাকার লোভ, না?…তা, তুই আমায় এতদিন দেখে শুনে ঠিক করলি, আমার লোভের বহর মাত্র পাঁচ হাজার টাকা? অত অল্পেই এমন দামী মাল তুলে দেবো পুলিশের হাতে?"

॥ চৌদ্দ ॥

নিজের ইতিহাস বলল বেচারাম। কথা আদায় করা, সন্ধান দেওয়া এসবের জন্যে যথেষ্ট নির্যাতন গেছে পুলিশের হাতে, দলের সবারই কমবেশী করে, তবে বেচারামের ওপর চোট সবচেয়ে বেশি। টাকা খাওয়াতে হয়েছে। শারীরিক নির্যাতন বন্ধ হলেও, কড়া নজর। সেও এক অসহ্য অবস্থা, জানা-অজানা সন্ধানী দৃষ্টির মধ্যে অষ্টপ্রহর কাটানো। কয়েকবারই মনে হল, একটু ফাঁক পেলেই সেও পাকিস্তানে পালাবে। কিন্তু তখন ওদিক থেকেই লোকের পালিয়ে আসা ক্রমে বেড়েছে। তাছাড়া, তার তো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বউ, বুড়ো বাপ ছেড়ে যাওয়া। এদিকে আবার পেট চলে না, পুলিশের হাঙ্গামেই সামান্য রোজগার যা ছিল কমে এসেছে, রঘুও নেই যে সেদিকে কিছু আশা। কি করবে ভাবতে ভাবতে একদিন মরিয়া হয়ে থানায় গিয়ে দারোগার পা জড়িয়ে ধরল—মরতে বসেছে বুড়ো বাপ আর বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে, যদি হুকুম দেন তো কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরির সন্ধান দেখি।

দারোগা মুখের দিকে চেয়ে বলল—"রোঘো ডেকে পাঠিয়েছে, না?"

বেচারাম বলল—"আপনি সঙ্গে পুলিশ দিন হুজুর, সে আমায় ডেকে পাঠিয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গিয়ে ধরতে পারবে, যদি আমায় তেমনি মনে করেন তো তাকে তো আর এর মধ্যে হুঁসিয়ার করে দিতে পারছি না। তারপরও বরাবর নজর রাখুন আমার ওপর।'

দারোগা একটা কাজ করছিল থানার বারান্দায় চেয়ার টেবিল নিয়ে, ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে একটা জায়গা দেখিয়ে বসতে বলল। কাজ শেষ হয়ে গেলে ভেবে নিয়ে বলল—'বেশ তোর রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তবে একেবারে পুলিশের চোখের নীচে। কলকাতায় আমার এক দারোগা-আত্মীয় একটা কাজের লোক চায়। ভালো চাকরি তবে একেবারে দারোগার চোখের নীচে। রাজী?"

রোজা খুলতে নওয়াজ ঢুকে পড়া। কিন্তু তখন তো আর পেছুবার উপায় নেই।

তবে দারোগা হোলেও ভালো লোক। তাছাড়া কিছু পরিচয় লিখে দিলেও

বেচারাম যে ব্যাপারটার মধ্যে নেই এটাও থানার দারোগা লিখে দিয়ে থাকবে, ওর সঙ্গে ব্যবহারটা ভালোই করতে লাগল নূতন মনিব। ফাই-ফরমাসের কাজ। কাঁচা বাজারও ওর হাতে এসে পড়ল। রান্নায় হাত আছে, ইচ্ছে করেই এগিয়ে তার দু-একটা নমুনা দিতে তারও দিকে কিছু কিছু টান পড়ল— বিশেষ করে ডিম-মাংসের পাট থাকলে। সহজেই বেশ ভাল কাজ দেখিয়ে আর বিশ্বাস জাগিয়ে নিল বেচারাম ; মাঝারি গোছের সংসার, মেয়ে-পুরুষ সবারই মধ্যে। কিছুদিন পরে ওর একটা ভালো চিঠি নিয়ে গ্রামে এসে থানার দারোগার সঙ্গে দেখাও করল। এরপর যখনই গ্রামে যায় থানায় গিয়ে দারোগার কাছে হাজিরা দেয়, কিছু খবর থাকলে পৌঁছে দেয়, হোল তো কোন একটা জিনিসই। ওদিক থেকে এদিকেও তাই। এই করে শুধু বিশ্বাসভাজনই নয়, খানিকটা পেয়ারের চাকর হয়ে উঠল দুজনের কাছে।

এরপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যে সুযোগটা এল, বেচারাম বলল সেটা নিতান্ত ভগবানের দয়া না হলে হয় না। মাসখানেকের মধ্যে এদিকে থানার দারোগা আর ওর মনিব দুজনেই বদলি হয়ে গিয়ে সন্দেহ, নজরে নজরে থাকা—যা কমেই এসেছিল, একেবারে তার সম্ভাবনাই গেল মিটে। মনিব সঙ্গেই রাখতে চেয়েছিল, বদলি হোল বাঁকুড়ায়, চায় তো চলুক বেচারাম। চাকরি বেশ খাতিরের, কিন্তু তবু তো দারোগা-পুলিশেরই মধ্যে থাকা, একটা দাগ রয়েছে, গ্রামে পরিবার ছেড়ে অতদূরে থাকা, তাও পাকিস্থান সীমান্তের গ্রাম—এই বলে কাটিয়ে দিল। একটা ভালো সার্টিফিকেট চেয়ে নিয়েছিল। দারোগার সার্টিফিকেট, তার জোরে একটা ভালো কাজ জুটিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হোল না। একটা কলেজের প্রিন্সিপালের খাস বেয়ারা! আজ মাস খানেক হোল রয়েছে এই কাজে। বাড়িতেই থাকে, সেখানেও বাজার করা থেকে অনেক কাজ সামলে দেয়। বেশ বিশ্বাস জমিয়ে নিয়েছে। আরও ভালোই আছে। তবে আর সবই ভালো হলেও বোষ্টম পরিবার—বাড়িতে মাছ-মাংস-ডিমের পাট নেই ; তাই শখ হলে কোন একটা হোটেলের আশ্রয় নেয়। তবে, বাসাটি খুব কাছেই বলে হোটেলটা বেশ ভালো হলেও এটাতে এল এই প্রথম।

রঘুর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে একটু হেসে বলল—'বুঝলি নে ?' চাকরও যে কপালগুণে বোষ্টম পেয়েছে এ ভুলটা ভাঙতে, যাই কেন ? আজ তোর সঙ্গে নেহাৎ নাকি দেখা হওয়ার বরাৎ, কি মনে হতে ঢুকে পড়ে কোণের দিকে

একটু গা ঢাকা হয়ে বসেছিলাম। তোকেই বললাম, ওরা সবাই জানে খাঁটি বোষ্টম। খাতির আছে খানিকটা।

গাঁয়ের বাড়ির কথাও বলল।

গেলে বেচারাম ওদিকে যায় না, পুলিশের নজর পড়বার ভয়ে। তবে খবর পায়। ভৈরব আর প্রসাদী আছে। প্রসাদীর দিনকতক মন্দা পড়ে গিয়েছিল, তবে ছুঁদে মেয়েছেলে, খাকোমণির পিসি, আর কর্তার আমলে সম্পত্তি দেখা-শোনা ওর হাতেই ছাড়া ছিল এর প্রমাণ দিয়ে কোর্টের কাছ থেকে হুকুমনামা নিয়ে ওই এখন সব দেখাশোনা করছে। পুলিশের দিক থেকে শুধু একটা চেক থাকবে যে সম্পত্তি বেহাত করছে কিনা।

আরও কিছু কিছু এদিক-ওদিক খবর দিয়ে রঘুকে বলল—'এবার তোর কাহিনীটা শুনি।...

রঘু ঠিক অতটা খোলা মন নিয়ে বলল না বা বলতে পারলই না। ঘা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন একটা সবার উপরই সন্দেহের ভাব এসে গেছে। খুশীই হয়েছে বেচারামকে পেয়ে, তবু সহসা একেবারে ষোলআনা বিশ্বাস করতে কোথায় যেন বাধছে। বলল না পাকিস্থানী সীমান্তে সেপাইদের ওর চুল-দাড়ি কামিয়ে দেওয়ার কথা। একটা বস্তিতে আছে, তবে বস্তিটা যে শেয়ালদার কাছেই একথা জানাল না। বরং অনেক দূরে একটা বস্তির কথা বলল, যাতে বেচারামের দেখবার আগ্রহ না হয়, হলেও যাওয়ার সুবিধা না হয়।

এর পর বেচারামের এভাবে অকস্মাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়ার কথাটা মনে হয়ে আরও একটা কথা বানিয়ে বলল—ফলে, মানদা দাসীর প্ররোচনায় এক ধাপ যে নেমে যেতে- বসেছিল, তার বদলে বেশ দু'ধাপ বরং আরও উঠেই পড়ল রঘু তার বর্তমান অবস্থা থেকে।

হোটেলের চাকরিটা মনের মতোই হয়েছে, অবশ্য যে অকূল অবস্থায় পড়েছে সেই হিসাবেই। কিন্তু হোটেল জায়গাই তো, কত রকমের কত লোকের আনাগোনা। আজ যেমন আচমকা বেচারামের নজরে পড়ে গেল তেমনি অন্য কারুর নজরেও তো পড়ে যেতে পারে। বেচারাম কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। এমন লোকও তো এসে পড়তে পরে যে হোটেল, পার্ক, স্টেশন, বাজার এই রকম লোকসমাগমের জায়গায় সন্ধান নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটু কাঁদুনিই গাইল বেচারামের কাছে। বলল—এমনই একরকম

ভালো হলেও চাকরিটার একটা দোষ, ভয়ানক খাটুনি। তাও যে একটা বাঁধা সময়ের মধ্যে তা নয়, খদ্দেরের চাপ পড়ল তো, থেকে সামলে দিয়ে যেতে হবে। সত্যিই, তাতে আপত্তি করাও যায় না। মনিবও তেমন সুবিধার নয়। এ চাকরির আর একটা অসুবিধা খানিকটা অনিশ্চয়তা। যেমন দিনকাল পড়েছে, বাঙালীদের ভালো হোটেলগুলো একে একে মাড়োয়ারী-ভাটিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। তারা একেবারে ঢেলে সাজাচ্ছে, তাতে পুরনো স্টাফেরও অনেককে বিদায় নিতে হচ্ছে, রঘু তো নতুনই…

যখন বলল, আরও ছোটখাট কাল্পনিক দোষ জড়ো করে বেশ গুছিয়ে বলল রঘু।

যখন পড়তা পড়ে, যোগাযোগও যে কী করে হঠাৎ অনুকূল হয়ে উঠে বলা যায় না। বেচারাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে কি একটা যেন ভাবছিল, বাধা দিয়ে বলে উঠল—"থাক বুঝেছি, তুই তালের মাথায় বেশ তুলেছিস কথাটা।… …এদিকে নয়, একেবারে দক্ষিণ কলকাতা—খিদিরপুর—রঘুর মনিবের বেহাই—বেশ অবস্থাপন্ন—আলিপুর কোর্টের পুরনো, নামকরা উকিল—একজন ভালো, বিশ্বাসী লোক খুঁজছে—রঘুর মতন বেয়ারারই কাজ—মনিবের কাছে রঘুর প্রশংসা শুনে রঘুকেই একদিন জিজ্ঞেস করছিল—আছে কিনা সন্ধানে লোক। লোকের তো কমতি নেই—গাঁয়ে গেলে ধরে ওকে সবাই এসে কিন্তু সাহস হয় না—তা, রঘু যদি করে তো বলুক, হয়ে যাবে।

—উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

উৎসুক, খানিকটা উত্তেজিত হয়েই শুনছিল রঘুও, তবে উত্তর দিল শান্ত-ভাবেই খানিকটা আশাহীনের ঔদাসীন্যের সঙ্গেই, বলল—"আজ হয়তো কাল নয়। কিন্তু হবে? যা কপাল।'

"হবেই।" জোর দিয়েই বলল বেচারাম। তখনই যেন একটু এলিয়ে পড়ে একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলল—"কিন্তু—কিছু মনে করিসনে রঘু—আমি নিজেকে টেনেও বলছি—চেষ্টা করি—সত্যিই মনেপ্রাণে চেষ্টা করি, আর ওপথে নয়—তবু ভয় হয়—কখন কি লোভে পড়ে যাব—সেই যে বলে না?—কয়লা হাজার ধুলেও তার রঙ বদলায় না…।"

"কিন্তু পুড়লে, রং বদলায় বেচু। আয়না দেখি চেষ্টা করে।…ওঠ, রাত হয়ে আসছে। কাল এই জায়গায়। কখন সুবিধে হবে তোর?'

'ধর, এই সময়? ছুটির পর খিদিরপুরে গিয়ে ঠিক করে আসব, একটু হয়েই যাবে রাত।'

'বেশ, কাল যাবও না হোটেলে। অসুখ হয়ে ছুটি নিয়ে এসেছি, ক্ষতি হবে না।'

॥ পনেরো ॥

হঠাৎ এমন একটা সৌভাগ্য, বিশ্বাস করতেও কোথায় যেন বাধছে রঘুর। দিন পাঁচেক একরকম বসেই কাটল, যে লোকটা ছিল, পুরনো লোক, বয়স হওয়ার জন্যই চলে যাচ্ছে। পাঁচদিনের দিন তার কাছ থেকে চাপরাশটা নিয়ে কাজ শুরু করল। ইতিমধ্যে মাপজোপ দিয়ে তার পোশাকটা হয়ে গেছে। হলধর জোৎদারের একমাত্র ছেলে কিন্তু এ ক্ষোভটা হোটেলের পোশাকের মধ্যে দিয়ে আগেই মিটে গেছে। ও এখন কিভাবে আছে, কি পোশাক পরছে, সে চিন্তা নয়; চিন্তা পূর্বের জীবন থেকে কতটা সরে আসতে পেরেছে, কতটা মুছে যাচ্ছে সে জীবনের যত ভয়, যত গ্লানি, কতটা মুক্ত হতে পাচ্ছে সে জীবন থেকে। সেদিক দিয়ে যা হোল তা তো কল্পনাতীতই।

কাজ যে হোটেলের চেয়ে ঢের হালকা শুধু তাই নয়, আরামেরও। মনিবের চেম্বারের বাইরে একটা বেঞ্চিতে ব'সে থাকা, ঘণ্টি বাজলে স্প্রিংয়ের দোর ঠেলে ভেতরে গিয়ে হুকুম নিয়ে আসা, তামিল করা। আটটার সময় বসেন উনি মক্কেল নিয়ে। তার আগে ভেতরের কিছু ফাইফরমাস থাকলে সেরে নেয়। সংসারটি ছোটই, ছিমছাম। বেটাছেলের মধ্যে উনি আর ওঁর ছেলে, ওঁরই জুনিয়ার; মেয়েদের মধ্যে গৃহিণী, একটি কন্যা, কলেজের ছাত্রী, পুত্রবধূ, তার একটি বছর তিনেকের কন্যা, আয়ার চার্জে।

কোর্টের সময় হ'লে নথিপত্র গুছিয়ে নিয়ে মোটরে করে সঙ্গে যাওয়া, সঙ্গে ফিরে আসা। বিকালে ভেতরেরই কিছু ফাই-ফরমাস। সন্ধ্যার পর আবার সকালের রুটিন। তবে একদিন বেশি কেস থাকলে কিছু দেরি হ'য়ে যায়। কর্তা নিজে বসেন কমই, ছেলেই তাঁর নির্দেশমত কেস সাজায় মক্কেলদের সঙ্গে বসে।

বেশ সহৃদয় পরিবারের সবাই। তার মধ্যে বিশেষ করে গৃহিণী। ওঁর আর পুত্রবধূর ফাই-ফরমাস সুচারুরূপে তো করেই, তাছাড়া কেনাকাটার ব্যাপারে

আগেকার বেয়ারার মতো হাতটান না থাকায় স্নেহটাকে বিশ্বাস দিয়ে আরও পুষ্ট করে তুলতে বিলম্ব হোল না।

মাইনে ভালো, খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এদিক থেকে, তাতে মাইনেতে একরকম একেবারেই হাত পড়ে না। সুস্থ পরিবেশে নিরুপদ্রব জীবনের আস্বাদ—স্বভাবটাও আমূল গেছে বদলে রঘুর। পূর্বের সমস্ত জীবনটাই এখন যেন একটা দুঃস্বপ্ন বোধ হয়, গ্রাম থেকে নিয়ে সমস্ত জীবনটাই একরকম বলতে গেলে। দুর্ঘটনার পর থেকে একটা যেন পরিবর্তন এসেছিল দারুণ দুর্গতির কবলে পড়ে, হোটেলে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত। তারপর—আজ সেকথা ভাবতেও বুকটা কেঁপে উঠে রঘুর—সহজলভ্যতার জন্যেই আবার কি সেই জীবনেরই সূত্রপাত হচ্ছিল না? রেস্তরাঁর একটা কোণের ঘরে প্রচ্ছন্ন 'বার' ছিল, সুরার ব্যবস্থা। এদিকে এসে শেষের দিকে দু'দিন সংযম হারিয়েছিল রঘু। অল্পই, যাকে বোতল-ঝাড়া বলা যায়, তাই…তবু—

এই সূত্রপাতের উপরই এসে পড়ছিল মানদাদাসীর ভাইঝি। ভাইঝি, কন্যা বা ব্যবসায়ের নিতান্তই সম্পর্কহীন একটি জীবন্ত পণ্য যাই হোক। গ্রামের জীবনের চেয়েও আরও ভয়ানক কি একটা হতে যাচ্ছিল। মনে মনে শিউরে ওঠে।

এখানে এসে আর একটা নূতন জীবনের আভাস পেয়েছে। পরিবারের গৃহিণী খানিকটা ধর্মভাবাপন্না। প্রতি অমাবস্যায় কালীঘাটে পূজা দিতে যান কন্যা পুত্রবধূ আর শিশু নাতনীটিকে নিয়ে। রঘুকে সঙ্গে যেতে হয়।

একটা যেন নূতন দিগন্ত জেগে উঠছে চোখের সামনে। কী যে হয়—এক একবার যেমন অতবড় সম্পত্তির মাঝখানে থাকোমণিকে বসিয়ে স্বপ্ন রচনা করতে ভালো লাগে, এই সুখী পরিবারের সঙ্গ পেয়ে—তেমনি এক এক সময় কাণ্ডে শাখায় একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দেয় রঘু—যাক, সব যাক—ভালোই হয়েছে থাকোমণি তার পথ মুক্ত করে চলে গেছে—সব নিশ্চিহ্ন করে লুটেপুটে খাক প্রসাদী।

মাসতিনেক কাটল।

বেচারামের সঙ্গে দেখা হয়। তবে খুব বেশী নয়। অনেক দূর কোথায় শেয়ালদা, কোথায় খিদিরপুর ফুরসৎও কম দুজনেরই, তবু এর মধ্যে বার চারেক হয়েছে দেখা। দুবার দু'জনের মনিব-বাড়িতেই। মেয়ে পুত্রবধূকে

নিয়ে গৃহিনী বেহানের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, সঙ্গে রঘু; বেচারামের মনিবও সপরিবারে এসেছেন মেয়েকে দেখতে। দুবার দু'জনেই ছুটি নিয়ে পার্কের সেই কোণটিতে বসে গল্পগুজব করল। এর মধ্যে শেষের বার যে ব্যবস্থাটা করল সেটা বেচারাম একবার দিন-তিনেকের ছুটি নিয়ে গ্রাম থেকে ঘুরে আসার পর।

রবিবারে বিকালে প্রায় ছুটি থাকে দু'জনের, যদি মনিবদের তেমন বিশেষ কিছু কাজ না পড়ে যায়। রঘু আগে এসেছে, ওর প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিল, বেচারাম দূর থেকে দেখতে পেয়ে একটু পা চালিয়ে এসে বলল,—"আয় বসিগে, খবর আছে।"

এগিয়ে গিয়ে দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসল। বেচারামই বলল—"জবর খবর, প্রসাদীর সঙ্গে দেখা এবার।"

রঘু বিস্মিত হয়ে চাইল, বলল—"তাই নাকি! তুইতো যাস না ওদিকে বলছিলি।"

বেচারাম বলল,—"ক্ষেতটা দেখতে যাচ্ছি, যে কটা ধান আছে, কাটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, গ্রাম ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছি, 'এই শোন।'—বাজখেঁয়ে আওয়াজ, ঘুরে দেখি প্রসাদীই হনহন করে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল—'কোথায় যাচ্ছ, ক্ষেত দেখতে? চলো।' যেতে যেতেই বলস—ডুমুরের ফুল হয়েছ। আস, কৈ ওদিকটা তো মাড়াও না।'

বললাম—'ছুটি থাকে না। একটা চাকরি পেয়েছি, এক-আধদিনের ছুটি নিয়ে আসি, একটু দেখেশুনে চলে যাই।'

মাঠের ধারে ডোবাটার কাছে এসে পড়েছি, বলল—'চলো বসি ওখানটায়, কথা আছে।'

দুজনে গিয়ে ঘাসের ওপর বসলাম। বুঝলাম ওৎ পেতে বসেছিল ও। বলল—'কলকাতা শহরে—ভালো চাকরি—চাপরাস আঁটা। সেসব শোনা আছে আমার। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম—সে নটের গুরুর সন্ধান পেলে?

বললাম—'পেয়েছি বৈকি।'

একেবারে চমকে উঠল। হালকাভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল নিশ্চয়। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল—'তার মানে? কোথায় দেখলে?'

হেসে বললাম—'হ্যাঁ, সেকথা তোমায় ব'লে বকশিষের পাঁচটি হাজার টাকা তোমার হাতে তুলে দিই!'

তারপরই কথাটাকে হালকা করে দিয়ে বললাম—'নাগো পিসি, সে জনসমুদ্দুর, সেখানে খুঁজে বের করা চাড্ডিখানি কথা ?'

ধূর্ত মেয়েছেলে, নিশ্চয় এই আন্দাজেই পেটের কথা বের করবার চেষ্টা করছিল যে যেখানেই থাকিস, তুই আমায় খুঁজে বের করবিই। সেই আন্দাজেই আর একটু এগিয়ে বলল—'চালাকি রাখো, প্রসাদীদাসীর কাছে ওসব চলবে না।'

এরপরই মুখের ভাব একেবারে বদলে ফেলে যেমন হঠাৎ সিধে হয়ে গিয়ে কথা বলে—আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল—'আচ্ছা, আমায় অবিশ্বাসটা কিসের তোমাদের ? লাখটাকার সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, এখন আবার এক হাতেই করছি, ওসব কোর্ট-পুলিশ আমার আঁচলে বাঁধা—ঢের দেখেছি ওরকম—কিন্তু, একটা কানাকাড়ি এদিক-ওদিক করেছি বলে কেউ বদনাম দিতে পারবে ? আমি কী না করে নিতে পারতাম, এখন আরও পারি—আমি কিনা কটা টাকার জন্যে পুরনো মনিবের ছেলেকে ফাঁসিকাঠে তুলে দেবো ?— তা পাঁচ হাজারই হোক আর দশ হাজারই হোক।'

ঐভাবে অনেক কথা। কোনটাই যে ভুল নয় তা তুইও জানিস রঘু, আমিও জানি। জ্বালিয়েছে এক সময়, কিন্তু তা সে নিজের স্বার্থে নয়, সেটা আমাদের দুজনের চেয়ে কেউ বেশি জানে না। প্রায় হাত করে ফেলেছিল। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাঝামাঝি করে বললাম—'দেখা এখনও পাইনি পিসি তবে মনে হয় সে কলকাতায় যদি থাকে আমায় খুঁজে বের করবেই। তখন মুকুবও না তোমার কাছে, অবিশ্যি, শুধু তোমার কাছেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফল কি ? লুকিয়ে পয়সা-কড়ি দেবে ? কিন্তু পুলিশ জাল ফেলে আছেই, একটু জানাজানি হয়ে গেলেই তুমি, আমি, সে এক দড়িতে বাঁধা হয়েই তো চালান হব।'

বলল—"তুমি ভুল বুঝেছ বেচু। আমি মোটেই লুকিয়ে দু পাঁচ দশ করে দেওয়ার কথা বলছিনে। আমি বলছি দেখা হলে কিম্বা যদি হয়েই থাকে, মুকুচ্ছ আমায়—তাকে বলো, সে নিজে বাড়িতে এসে বসুক। ভিকিরীর মতন দু-দশ টাকা ? আমি সমস্ত সম্পত্তি ওর হাতে তুলে দেব। বেরিয়ে আগে পুলিশের হাতেই পড়বে। পড়ুক, সেখান থেকেই লড়ুক নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নিজের সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে। ছুঁড়ি যে গলায় দড়ি দিয়েই মরেছে, তাকে কেউ গলা টিপে মেরে লটকে দেয়নি একথা যেমন সত্যি,

তেমনি প্রমাণ করাও শক্ত নয়। অনেক উপায় আছে, হলধর সামন্তর এতবড় সম্পত্তি, একটু একটু করে বাড়িয়ে যাচ্ছি এখন—সমস্তটা ঢেলে দোব ওকে বাঁচাতে—বাছা কাউনসিলি আনব কলকাতা থেকে—ওসব ময়না-রিপোর্ট কোথায় ভেসে যাবে।"

বেচারাম থামল। পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বের করে একটা বিড়ি রঘুকে দিল। একটা নিজেও ঠোঁটে চেপে দেশলাই বের করে দুজনে বিড়ি ধরিয়ে বলল—"আরও অনেক কথা। · এখন, কি বলিস?"

দুজনে নীরবেই টেনে যেতে লাগল। এক সময় রঘু বলল—"ভাবতে দে একটু। প্রসাদীপিসি সে মানুষটা ঐ, নিজের জন্যে কিছু করেনি—ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারত এটা সত্যি আমার মতন কেউ জানে না—ঐ যা বললি যতই জালিয়ে থাক না কেন আমায়। তবে এক কথাতেই হাতে তুলে দেওয়া নিজেকে…"

দুটো টান দিয়ে একটু হঠাৎই বলে উঠল—"হ্যাঁ, একটা কথা বেচু—কদিন থেকে আমার মনে আনাগোনা করছে, তোকে আজ বলব মনে করেই এসেছিলাম। তোর কথাতেই চাপা পড়ে গিয়েছিল—আশ্চর্য, প্রসাদী পিসি যা বললে তার সঙ্গে অনেকখানি মিলও আছে সে কথার…'

'কথাটা?'—কৌতূহলভরে চাইল চোখ তুলে বেচারাম।

রঘু বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল—"আজ থাক। একটু ভেবে নিতে দে গুছিয়ে। কাল সন্ধ্যেয় গিন্নি সবাইকে নিয়ে বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তোর ছুটি থাকেই ওসময়, এখানেই চলে আসব। আজ দেরিও হয়ে গেছে, আমি অনেকক্ষণ হল এসেছি।'

॥ ষোল ॥

পূর্ণ মুক্তি না হলেও অনেকখানিই তো। ভদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে ভালোভাবে থেকে, জীবনে মুক্ত আলোবাতাসের স্পর্শ পেয়ে আবার ভালোভাবে বাঁচার ইচ্ছা হয়ই; ক'দিন ধরে তারই কথা ভাবছিল রঘু। একজন বিচক্ষণ আইন-জীবীর নিত্য সাহচর্যে থেকে তাঁর চেম্বারের পাশে বসে নানারকম মোকদ্দমা সাজাবার বিবরণ শুনে, কোর্টে নিত্য যাওয়া আসা করে, কোর্ট মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে একটা সাধারণ আশঙ্কা থাকে, দূরে দূরেই থাকবার ইচ্ছা—সেটা

ওর প্রায় নষ্টই হয়ে গিয়েছিল ; মনটা সেই আদালতের দিকেই চলল। ও যে খুন করেনি তা ওতো জানে ; খুন করেও যখন রেহাই পেয়ে যাচ্ছে লোকে, তখন এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে না থেকে বেরিয়ে এসে একটা ঝুঁকি নিক না। এ জীবন্মৃত হয়ে থাকা, চিরকালের জন্যে—তার চেয়ে যদি বিফলমনোরথ হয়ে শেষ হয়েই যায় এ জীবন, তো সে-ও তো ভালো।

সুস্থ জীবনে মনটা ভালোর দিকেই এগিয়ে চলে। · এই চাপরাস-আঁটা চাকরি—অবস্থাগতিকে আজ না হয় সুখের, তবু চাকরিই। এর পাশেই দাঁড়িয়ে হাতছানি দেয় দেশের বিপুল সম্পত্তি। রীতিমতো চঞ্চল করে তোলে মনটাকে।

কিভাবে এগুনো যায় ভাবছিল সেই কথা। ভাবছিল বেচারাম এলে তার কাছে তুলবে কথাটা, পরামর্শ করবে দুজনে, ওর পক্ষে দাঁড়াল, মেঘ না চাইতেই জল ; বেচারাম একটা সুস্পষ্ট আকার দিয়ে ওর চিন্তাটাকেই যেন ওর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রসাদীর শক্তিতে ওর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। একদিন বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল; আজ যদি অনুকূল হয় তো কী না হতে পারে ?

বেচারামের সঙ্গে পরের দিন যখন দেখা করল তখন ওর চিন্তাটা আরও স্পষ্টতর রূপ নিয়ে আরও একটা সম্ভাবনার দিকে এগিয়েছে। সেই কথাই বলল ওকে, উত্তেজনায় শরীরটা একটু কাঁপছে, মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, বলল —"প্রসাদীপিসি যদি করে সাহায্য তো আর একটা কথা ভাবছি বেচু, তুই-ও ভেবে দেখ।"

"কি ?—বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গেই প্রশ্ন করল বেচারাম।

"আমার মনিব ফৌজদারি সাইডে একজন খুব বড় উকিল · ইয়ে···আমায় ভালও বাসেন···গিন্নি তো একেবারে ছেলের মতন···তাই · "

বেচারামের মুখের চেহারা দেখে থেমে গেল। চোখ বড় বড় করে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, প্রশ্ন করল—তাই সব কথা বলেছিস্ তাঁদের।"

রঘু অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে সংযত কণ্ঠে আমতা আমতা করে বলল—"না, বলিনি·· তোকে না জিজ্ঞেস করে বলব ? তুই-ও তো জড়িয়ে পড়ছিস এর মধ্যে।"

সেই হঠাৎ উদ্বেগের ভাবটা কমে গিয়ে চোখ দুটো নরম হয়ে এল বেচারামের, নরম কণ্ঠেই বলল—'আমার কথা ভেবেই বলছিনে আমি, একদিন

একসঙ্গে অনেক কিছু করেছি, আজ একসঙ্গে না হয় হাজতের দিকেই পা বাড়াতাম। সে ভয়ে নয়। আমি বলছিলাম,...দাঁড়া..."

চিন্তা করতে করতেই পকেট থেকে বিড়ির কৌটোটা বের করে দুজনে দুটো বিড়ি ধরাল। অন্যমনস্কই। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—"কথাটা তোর ভেবে দেখবার মতন বলেই মনে হচ্ছে, তবে আমি বলছিলাম, সাত তাড়াতাড়ি কানে তুলে দেওয়ার এমনকি দরকার পড়েছে? এদিকেও তো অনেক কিছু ভাববার আছে। এই ধর না কেন—ভালোবাসে, খাতির আছে, ভালো কাজ করিস, হাতটান নেই, চাকর হলেও ভদ্রঘরের ছেলের মতন আচার-ব্যবহার, এই জন্যেই তো, না আর কিছু? সেই লোক একজন ফেরারী আসামী—খুনের দায়ে মাথার উপর পাঁচ হাজার টাকার বকশিষ ফেলা রয়েছে—শোনামাত্রই কি সব ভালোবাসা, সব খাতির লোপ পেয়ে যাবে না? পরে সব শুনে না হয়...তাও তো কি ভাবে নেয় জোর ক'রে তো বলা যাচ্ছে না। তাই..."

"তাহলে থাক বেচু! হ্যাঁ, ভুলই হচ্ছিল, একদিকটাই নজরে পড়েছিল আমার।'

বেচারাম সেইভাবে বিড়িই টানতে লাগল—আস্তে আস্তে। এক সময় বলল—"খুব যে ভুলই হয়েছে এমন কথাও বলতে পারি না রঘু। যে লোকটা ডুবছে সে একটা কুটোও হাতের কাছে পেলে মুঠিয়ে ধরে এতো একটা নৌকোর গলুই-ই। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে ভেবে দেখ।"

"কি?"—ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল রঘু।

"এমন একটা মোওকা ছাড়া ঠিক হবে না, তবে খুব পা টিপে টিপে এগুতে হবে। তা হলে আমার মনে হয় তোর দিক থেকে কথাটা না তুলে আমার দিক থেকে তোলাই ঠিক হবে যেন...'

"তুই বলবি? তাহলে তো!"...উল্লসিত হয়ে উঠল রঘু।

বেচারাম বলল—"কি ভাবে সইয়ে সইয়ে পাড়ব কথাটা ভেবে দেখতে হবে, তবে এটা ঠিক যে একেবারে তোর মনিবের কানে তোলা ঠিক হবে না। আমার মনিবের কানে তো আর নয়, লেখাপড়া নিয়ে থাকা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, সবটা শোনবার আগেই হৈ-চৈ করে উঠবে। আমি ভাবছি, আগে মনিব-গিন্নিকে বলব, সোজাসুজি তোর নাম করেও না—ঘুরিয়ে—কিছু বাদসাদ দিয়ে, কিছু আবার জুড়েও। খানিকটা সাজিয়ে বলে ধরে পড়া যদি উনি ওঁর

বেহাইয়ের কাছে তোলেন কথাটা—আমার আত্মীয় এখন লুকিয়ে আছে, থাকবেই তো—নিরুদ্দেশ হয়েছে এইভাবে রটিয়ে উনি ভরসা দিলে সামনে এনে ফেলি তাকে…"

"কিন্তু…" বলে কি একটা ফিকড়ি তুলতে যাচ্ছিল রঘু—বেচারাম বলল—"এই পর্যন্তই থাক আজ। অনেক কিন্তুই আছে এর মধ্যে, যত সহজ মনে হচ্ছে তত নয়। একটু ভালো করে ভাবতে দে, তুই-ও ভাব। কাল কোনও ছুতোনাতা ক'রে আসতে পারবি? আজ আমার একটু কাজও আছে এক জায়গায়।"

বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠতে উঠতেই বলল। রঘুও দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"পরশু কি একটা যোগে কাছারির ছুটি। কাল খোকাবাবু সবাইকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। থাকতে হয় সঙ্গে, একটা কাটান্ দিয়ে ছুটি নিয়ে নোবখন।

পরদিন বেচারাম অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে পাইচারি করছিল, রঘুকে প্রবেশ করতে দেখে এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে বলল—"আয়, অনেকক্ষণ ধরে ওপিক্ষে করছি। মাথাটা খুলে আসছে বলে মনে হচ্ছে—আর তুইও নয় আমিও নয়—আন্দাজ করতো তাহলে আর কে?"

পাশাপাশি আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে অল্প একটু হাসি নিয়ে মুখের পানে চাইল। রঘু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, বলল—"পারলিনি? বোস।'

বসে পড়ে, ওকেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলল—"অথচ ওর কথাই আগে মনে পড়া উচিত ছিল। প্রসাদীপিসি।"

প্রসাদীপিসি! হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল রঘু।

"কেন নয়? আমরা দুজনে একেবারে বাদ পড়ে গেলাম। ওর মনিবের ছেলের নামে হুলিয়া, খুনের দায়ে—নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ ও জানে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ—প্রমাণ দেবে, এতদিন তোলে নি কথা, ভালো করে প্রমাণ জড়ো করছিল—এতদিন সন্ধানও পাচ্ছিল না—দুদিন হলো লুকিয়ে একটা চিরকুট প্রসাদীর ঘরে ফেলে দেয়। লেখা আছে, প্রসাদী যদি ভরসা দেয়, ব্যবস্থা করতে পারে তো দেখা করে—ও খুন করেনি—কি করে কি হয়েছে—কার ওপর সন্দেহ রঘুর—কেন সন্দেহ, সব বলবে। প্রসাদী উকিলের পরামর্শ নেবে।"

ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল—"তোর হাতের লেখা দেখা আছে তোর

মনিবের ?···ভালো করে মনে করে দেখ, দেখা থাকলে অন্যভাবে এগুতে হবে।"

রঘু স্মরণ করবার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে বলল—"না, লেখা তো কখনও কোনও দরকার হয় নি। গাঁ ছাড়ার পর।"

"বহুত খুব।"

বেচারাম পকেট থেকে ভাঁজ করা খানিকটা কাগজ আর একটা পেনসিল বের করল। রাস্তার আলো এসে পড়েছে হাত কয়েক দূরে, দুজনে সরে গিয়ে ঐ মর্মে ছোট একটা চিঠি দাঁড় করাল। বেচারাম পকেটে রেখে দেওয়ার পর আবার দুজনে সেই জায়গায় এসে বসে প্রশ্ন করল—"কি রকম বোধ হচ্ছে ?"

আশায় চাপা উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছে রঘু। একটু চেয়েই রইল ফ্যালফ্যাল করে। চোখের গোলক দুটো ঘুরছে, যেন এত সাজানো কাহিনীটার মধ্যে কোথায় খুঁৎ আছে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে, কোন এতটুকু খুঁৎ যাতে না থাকতে পায় তারই জন্যে। এক সময় মুখটা যেন পাওয়ার সফলতাতেই একটু দীপ্ত হয়ে উঠল, বলে উঠল—"বাঃ, প্রসাদীপিসি যাওয়া আসা করছে অথচ চিনতে পারল না আমায় !"

"চাপরাশ উর্দি—তা ছাড়া তোর চেহারাও আগেকার থেকে অনেক বদলেছে—সে একথার অনেক কাটান আছে।...এতর মধ্যে ও নিতান্ত একটা বাজে আপত্তি তুলতে গেল—চিনলে না কেন ?

ছলছল করে উঠল রঘুর চোখ দুটো। দু'হাত দিয়ে ওর হাত দুটো ধরে ফেলে আবার সেদিনকার মতো হু-হু করে কেঁদে উঠে বলল—"আমায় বাঁচা বেচুভাই, আর সহ্যি হচ্ছে না।"

দ্যাখো, কাঁদে ছেলেমানুষের মতন !—যখন এমন যোগাযোগ—দেখে আরও বুক বাঁধবার কথা ! চুপ কর।"

হাত দুটো আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—পরশু ছুটি ?—কই শুনিনি তো। হয়তো কোন্ বোষ্টম যোগ নয়, তাই কর্তার খেয়াল নেই। আমার এদিকে একটানা নিরিমিশের দুর্ভোগ চলেছে, আর পারিনে বাবা।"—একটু রসিকতা করল মনের স্ফূর্তিতে। ওর কাঁধটা চেপে নিজের সঙ্গে তুলে নিয়ে বলল—"ওরে, ভালোই হোল, তাহলে পরশুই হয়ে আসি না কেন গাঁ থেকে ? কি বল ?"

॥ সতেরো ॥

মঙ্গলবার, অমাবস্যা, আরও কিসব মিলিয়ে একটা বিশেষ স্নানের যোগ এসে পড়েছিল, তারই ছুটি। গৃহিণী মেয়ে আর পুত্রবধূকে নিয়ে কালীঘাটে এসেছেন, রঘু সঙ্গে আছে।

বেশ ভিড়। ড্রাইভার ক্ষেত্রপদ লোকটা বেশ শক্ত-সমর্থ, ভিড়ে পথ করে ওঁদের নিয়ে যেতে সেই সঙ্গে গেছে, রঘু সামনের সীটে বসে মোটর আগলাচ্ছে।

সময় পেলেই এখন ওর পরশুকার চিন্তা ; প্রসাদীর এসে কথাটা তোলা, মোকদ্দমায় নামা। নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা যাচাই করছে মনে মনে। চারিদিকে মুক্ত জীবনের চঞ্চলতা—এতো লোকের এত নানা প্রকারের—ওর নিজের মুক্তি-সম্ভাবনার ভেতর দিয়ে বড় যেন নূতন ঠেকছে আজ। নয়তো স্নান থেকে নিয়ে নানাজাতের মেলাই তো দেখেছে কত।

ওঁদের স্নান-পূজা সেরে আসতে ঘণ্টাদেড়েকের ওপর লেগে গেল। ওঁরা উঠে বসেছেন রাশীকৃত মোটর, তার মধ্যে থেকে কি করে নিজেদেরটা বের করবে স্টার্ট দিয়ে তার রাস্তা দেখছে ক্ষেত্রপদ, রঘু যেন অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে ঘুরে গৃহিণীকে বলল—"আমিও না হয় একটা ডুব দিয়ে আসব মা ?"

লজ্জাতে মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠেছে। অনেকবারই এসেছে সঙ্গে, কিন্তু কখনও স্নান করা বা পূজা দেওয়া—সেসবের দিকে যায়নি। একবার গৃহিণী জিজ্ঞাসাও করেন—ও চায় তো ওঁরা একটু অপেক্ষা করেন, অল্প একটু হেসে কাটিয়ে দিয়েছে—থাকগে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, এইতেই হয়ে গেছে আমার। নদীর চানটা সয়না।' গৃহিণী আজ ওর কথা শুনে আগ্রহের সঙ্গেই বললেন—'যাবে তুমি ?—তা বেশ, যাও না। একলা মানুষ, বেটাছেলে, তোমার তো দেরি হবে না।'

তখনই প্রশ্ন করলেন—কিন্তু কাপড় গামছা এনেছ ? কৈ, দেখলাম না তো।'

রঘু দোরটা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে বলল—"আমি ভিজে কাপড়েই চলে যাব। আপনাদের আমার জন্যে ওপিকে করতে হবে না।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে।

গৃহিণী বললেন—"বাঃ, তা কি হয়? এই বল ঠাণ্ডা সয় না।"

"তাহলে না হয় থাক……"

আবার দোর খুলে উঠতে যাবে, উনি বললেন—"না, না একটা কথা যখন মনে হয়েছে—মার মন্দিরের দরজায়—তুমি এই নাও……"

ভ্যানিটি ব্যাগটার মুখ খুলছিলেনই, দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললেন…"একটা কাপড় আর একটা গামছা কিনে নাও গে……সে কি কথা!—একটা এমন যোগ—হঠাৎ এসে পড়েছে—যাও, সেরে এসো।"

স্নান পর্যন্ত তাড়াতাড়িই হয়ে গেল রঘুর। কূলে কূলে ঠেলে ওঠা গঙ্গার জোয়ারের মতো ওর মনেও কী যেন একটা ঠেলে উঠছে। স্নান করে মন্দিরের দিকে হাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম করে চলেই আসছিল, গলির চৌমাথায় এসে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল—এদিকটা যখন বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, পূজাটা দিয়ে এলে কেমন হয়?…চাপ ভিড়—কিন্তু যাদের দেওয়ার তারা তো দিয়েও নিচ্ছে এর মধ্যে।

সেই জোয়ারটাই যেন সামনে ঠেলে নিয়ে গেল ওকে। একটা দোকানের সামনে চাপ ভিড়ের মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে দাঁড়াল।

ওর সামনে দুজন লোক। একজন বেশ লম্বা-চওড়া, ওর একেবারে সামনেরটি; পাশের লোকটা একটু ক্ষয়া গোছের। তারই পাশ কাটিয়ে এগুতে যাবে, একটু ঠেলে, হঠাৎ 'বাঘ-আঁচড়া' কথাটা কানে যেতে বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ওরা দুজনেও দোকানীকে ফরমাস দিয়ে সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে; ওদের সামনেও এলোমেলোভাবে দুতিন সারি লোক, রঘুর মনে হোল কথাটা ক্ষয়া যেন লোকটার মুখ থেকে বেরুল। কি প্রসঙ্গে বোঝা গেল না। একে তো একটু চাপা গলাতেই বলা, তার ওপর কান খাড়া হয়ে উঠলেও ভিড়ের মিশ্র আওয়াজের মধ্যে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। 'বাঘ-আঁচড়া' নাম দিয়ে কোথায় যেন আরও একটা জায়গা আছে বলে শোনা আছে রঘুর—মনটাকে সেই প্রবোধই দেওয়ার চেষ্টা করছে, এর পরই পাশের লোকটার গলা। বামন দাসের বাজখেঁয়ে গলা মার্কামারা এক এক জনের যেমন মিহি আর মেটায় পাশাপাশি আওয়াজ বেরোয়, সেইরকম। ও-ও চেপেই বলছে, তবে তার মধ্যে যেন লুকোচুরি করে কয়েকটা কথা ভিড়ের আওয়াজের মধ্যেও অসংলগ্নভাবে কানে গেল—"শালা দুটে…ভুল ঠিকানার…নিজে মারবে সব ট্যাকা…সমস্ত দিন ‥কালীঘাটে নেই…গলি…কাল আবার…"

শরীরটা ঝিম ঝিম করছে রঘুর। যেন শরীরের সমস্ত রক্ত নীচে নেমে গেছে। ঠিক মানে ধরতে পারছে না শুধু একটা তীব্র অনুভূতি—তার সঙ্গেই গায়ে-গায়ে লাগা বামনদাস। হ্যাঁ, বামনদাসই বৈকি, এখানে এভাবে দেখবে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি বলেই চেনেনি, পেছন থেকে হলেও—আওয়াজে চেনাল।···বামনদাস। হাত খানেক দূরেও নয়—ওর পিঠ এর বুক একেবারে সেঁটে রয়েছে লোকের চাপে।

চাপ ভিড়ে বেরুতে পারছে না—শুনতে হচ্ছে। "কে চাপ দেয়"—ব'লে ঘুরতে পাবে বামনদাস—যে কোনওমুহূর্তে—পাঁচ হাজার টাকা!—সঙ্গে সঙ্গে!···

নিজের চেষ্টায়, কি, ছিপছিপে শরীরটা ভিড়ের চাপেই নীচে আপনিই গলে পড়ল ঠিক বুঝতে পারল না রঘু। কত পায়ের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কি করে কখন মোটরের জঙ্গলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, একেবারে সাড় নেই। থরথর করে কাঁপছে, ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে চাইতে চাইতে।

কানে গেল—"এই যে এখানে!!"

ভিড়ের আওয়াজ চিরে ক্ষেত্রপদর গলা। বেশ খানিকটা দূরে। কতটা যেন সম্বিত এল রঘুর। পার্ক-করা মোটরের সারির মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল। ভুলও করছে। ক্ষেত্রপদর আওয়াজ লক্ষ্য করে টলতে টলতে গিয়ে উপস্থিত হোল।

ইসারাতে দোরটা খুলতে বলল, ক্ষেত্রপদকে। টহতে টলতে গিয়ে ওর পাশে ব্যাপারটা জড়িয়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

যখন পৌঁছল বাড়ি চৈতন্য নেই, শুধু মাঝে মাঝে প্রবল কাঁপুনির আক্ষেপে জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে।

সবাই ভয় পেয়ে গেছেন। গৃহিণী বলছেন—"বলেছিল নাওয়া সয় না নদীতে···কেন মরতে জোর করলাম—পরের ছেলে!"

ব্র্যাণ্ডি দেওয়া হোল। মোটরেই। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলল রঘু, চোখদুটো জবাফুল হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে অবোধের মতো চেয়েই রইল। তারপর পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে একটু যেন অপ্রতিভভাবেই দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, ক্ষেত্রপদ আর বাড়ির পাচকঠাকুর এগিয়ে এসে পাঁজায় করে ওর ঘরে গিয়ে ওর চৌকিতে শুইয়ে দিল। ছুটির দিন সবাই জড়ো হয়েছে—কর্তা ওপরে ছিলেন, এসে বাড়ির ডাক্তারকে ফোন করে দিতে বললেন।

বেশ সাড় ফিরে এসেছে রঘুর। লজ্জিতভাবে বলল—"দরকার হবে না।'

উনি করে দিতেই বললেন ফোন, ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—"চাউনিটা এখনও বেশ সহজ নয়।"

ডাক্তার এসে আর এক ডোজ ব্র্যাণ্ডির ব্যবস্থা করলেন। তেমন কিছু নয়। হঠাৎ ঠাণ্ডাই, খুব বেশিরকম। খানিকটা উত্তাপের ব্যবস্থা, আর সম্পূর্ণ আরাম, নড়াচড়া নয়।

ভোরে উঠে খোঁজ নিতে এসে দেখা গেল রঘুর ঘর শূন্য। এবাড়ির দেওয়া সবই ঠিক রয়েছে, শুধু ওর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা নেই। নিজের জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় টুকিটাকি রাখবার জন্য একটা ছোট ট্রাঙ্ক কিনেছিল, সেটাও খালি পড়ে রয়েছে।

॥ আঠারো ॥

একেবারে শেষরাত্রের দিকে কখন একটু ঘুম এসে গিয়ে থাকবে একসময় যখন সেটুকুও ছাঁৎ করে ভেঙে গেল। তখনও বেশ অন্ধকারই। ঘরটায় দুজনে থাকে, ও আর পশ্চিমা পাচকঠাকুর। তখনও নাক ডাকিয়ে গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য। ট্রাংকটা খালি করে ক্যাম্বিসের থলিটায় সবগুলো পুরল রঘু। গ্রিলবসানো উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। ফটকের চাবিটা ওর কাছেই থাকে, ব্যাগটা নিয়ে খুব সন্তর্পণে ফটক খুলে বেরিয়ে পড়ল। দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেছে, দাঁড়িয়ে একটু ভাবল, তারপর তালাটা আবার এঁটে দিয়ে ভেতরের ছোট্ট বাগানটার এক পাশে চাবিটা ফটকের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে ফেলে দিল। ভোরে উঠেই কেউ যেন না সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে পারে। ওর সন্ধানে লোক না ছোটে।

শীতের প্রত্যুষ, সমস্ত পাড়াটা সুষুপ্ত, অন্তত এখনও ঘণ্টা খানেক বাড়ির কেউ উঠবে না।

হন হন করে উত্তর দিকে চলল রঘু, গলি-ঘুচি দিয়েই। খিদিরপুরের পুল পেরিয়ে ট্রামের রাস্তা ধরল। মাঠের মাঝখান দিয়ে নির্জন পথ, তবু থেকে থেকে ঘুরে দেখছে। যখন এস্প্ল্যানেডের কাছাকাছি হয়েছে, পেছন দিকে ট্রামের আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা স্টপের কাছেই। এর পরেই এস্প্লানেড, তবু হাত দেখিয়ে উঠে পড়ল, যতটুকু এগিয়ে থাকতে পারে।

নেমে একটা হাওড়া-গ্রামী ট্রামে উঠে পড়ল। ষ্টেশনে তখন অল্পই লোক, তবে হাওড়া ষ্টেশনই, যারা রয়েছে সবাই ব্যস্ত। একটা প্লাটফর্মের দিকে প্যাসেঞ্জারের স্রোত কিছু বেশি যেন। একজনকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করল— "ও গাড়িটা কোথায় যাবে?"

"ধানবাদ।" উত্তর দিল লোকটা।

"সে কতদূর?"

"তুমি যাবে কোথায়?"

'আমি?—আমি?—আমি যাব…'

বাতুলের কাছে নষ্ট করবার সময় না থাকায় লোকটা একটা বিরক্তির দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

"শুনুন, কখন ধানবাদের গাড়িটা ছাড়বে?"—পরের একজনকে প্রশ্ন করল।

"আর পাঁচ মিনিট…"

লোকটা হাতঘড়ি দেখে বলতে বলতেই বেরিয়ে গেল।

হলের বড় ঘড়িটার দিকে চাইল রঘু। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কারুর এসে পড়বার ভয়ের সেই চটানিটা ঘুরে ঘুরে—সেটা এখনও যায়নি।

ওদিকটায় আর তেমন লোক নেই, তার মানে, আপাতত দূরপাল্লার 'গাড়ি নেই নিশ্চয়। রঘু লোকাল ট্রেনের দিকে চলে এল। এবার বেশ সহজ মানুষের মতোই একজনকে প্রশ্ন করল—বিশেষ ষ্টেশনের নাম ধরে—' "এধারের গাড়িটা কখন ছাড়বে বলতে পারেন?"

কলকাতা ছেড়ে যতটুকু যাওয়া যায়।

'ছটা ছেচল্লিশ। ঐ কাউণ্টার, আসুন আমিও যাচ্ছি।'

ওর পেছনে কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াল রঘু। বর্ধমানে যখন পেঁছাল, তখন বেশ বেলা হয়েছে দ্রুতগামী ট্রেনে মিনিটে মিনিটে দূরত্বটা বেড়ে গিয়ে যখন নামল, তখন ওর মন অনেকটা সহজ। তবে শরীরটা একেবারে অবসন্ন। কালীঘাটে বামনদাস আর তার সঙ্গীকে পেছন থেকে দেখা পর্যন্ত, তাদের অসংলগ্ন কথা শোনা পর্যন্ত ঐ এক চিন্তার চারিদিকে ঘুরেছে মনটা। স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না, তবে বামনদাস আর মুটবিহারীর মাঝখানে একটা যে লুকোচুরি চলেছে এবং তার সঙ্গে রঘুর তল্লাসীর যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সেটা ঐ অসংলগ্ন কথার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। মুটবিহারীকে তাহলে বামনদাসই

লাগিয়েছিল এ কাজে, তাকে সীমান্ত পেরিয়েই যে দেখতে পেল রঘু,—নৈলে পুরস্কারের ভাগ-বখরার কথা এল কোথা থেকে? শুধু মুটবিহারীই নয়। যে ক্ষয়াগোছের লোকটা বামনদাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল—রঘু আগে দেখেনি —সেও তাহলে বামনদাসের চর আরও কত চর—আছে কলকাতায় ছড়ানো কে জানে?…

সমস্ত রাত ঐ এক চিন্তা, ঘুম হয়নি। খিদিরপুর থেকে এসপ্ল্যানেড, শীতের ভোরের ঠাণ্ডায় পায়ে হেঁটে, তারপর এই গাড়ির ধকল, প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে শরীর যেন আর বয় না রঘুর। একঠায় তিন ঘণ্টা গাড়িতে ক্রমাগতই বাড়তে থাকা ভিড়ের মধ্যে পা নামিয়ে বসে থাকার জন্যে পা দুটোও ভেরে গেছে। সাড় ফিরিয়ে আনবার জন্যে দাঁড়িয়ে একটু নড়েচড়ে নিচ্ছিল, একটা কুলি এগিয়ে এসে হাতের ব্যাগটা ধরে নিয়েই বলল—"দিন বাবু কোথায় যাবেন—বাইরে, না টিরেনে?'

ব্যাগটা একটু বড় আর ভরাট হলেও এমন নয় যে নিজে নিয়ে যেতে পারে না; এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত তো নিয়েও এল বয়ে, তবে যেন মনের সঙ্গে শরীরটাকেও হালকা ক'রে নেওয়ার জন্যই দিয়েই দিল রঘু। যদিও তখনও কিছুটা অন্য-মনস্ক—"পশ্চিমের ট্রেন কতক্ষণে পাব?"

"তুফান ইসপ্রিস, সাড়ে এগারহ এক নম্বর প্লাটফর্মে লাগবে।"

"তার আগে কোন গাড়ি নাই?"

"না, ডাউনের গাড়ি আছে, বম্বে মেল ন'টা উনচাস, দার্জিলিং—দশটা বিশ…'

কুলিরা যেমন কখনও কখন কত খোঁজ রাখে তার অযাচিত পরিচয় দেয়। ওর উত্তরের অসঙ্গতিতেই মনটা ভালোভাবে ঘুরে গেল রঘুর, একটু বিরক্তভাবেই বলল—"দেখছিস ওদিককার গাড়ি থেকেই নামলাম।"

প্রশ্ন করল—"তাহলে এতক্ষণ?"

"থার্ড গিলাস ওয়েটিং রুমে আস্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবেন।"

"সে কথা মন্দ নয়।…তার আগে নেই তো কোন গাড়ি?"

'না।'

'নিয়ে চল্। ভেতরে, না, বাইরে?'

'বাইরে, আসেন আমার সঙ্গে।'

আর সন্ধানী দৃষ্টির কোনও সম্ভাবনাই নেই, তবু আগে-পেছনে সমস্ত প্লাট-

ফরমটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে রঘু কুলিটার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসে ওয়েটিং হলটায় পৌঁছে কুলিটাকে বিদায় করল।

বেশ ভিড়। ভিড়ই খুঁজছে, হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়া ইস্তক যে একটা স্বস্তির ভাব জেগে উঠছিল মনে, ভিড় দেখে সেটা আরও গেল বেড়ে। ভিড়টার প্রকৃতিও একটু ভিন্ন রকমের। মেয়ের ভাগই বেশি, পুরুষ কম, আর যেন দলে দলে বিভক্ত। বেশ চঞ্চলও, তার সঙ্গে স্ত্রীলোক বেশি বলেই বচসা, আর কাজ-অকাজের কথা মিলে হলটা গম-গম করছে। হট্টগোলই একটা।

ঠিক যা চায় রঘু। বাইরেই ব্যাগটা রেখে দাঁড়িয়েছিল, একবার ভালো করে ভেতরটা দেখে নিয়ে, ব্যাগটা হাতে করে ফাঁক বেছে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগুল। জনারণ্য, তায় বিক্ষুব্ধ যত গভীরে গিয়ে পৌঁছানো যায়, ততই নিরাপদ।

এ ধরনের ভিড়ে যেমন হয়ে থাকে—বাইরের দিকটা যতটা অবিন্যস্ত ভেতরটা তেমন নয়। আগে যারা এসেছে, তারা গোছগাছ করে নিয়ে বসেছে। টপকে-টাপকে পৌঁছাতে কিছু কটু মন্তব্য হজম করতে হল। তবে পৌঁছে গিয়ে আর তেমন বাধা-আপত্তির সম্মুখীন হতে হলো না। মৃদু গুঞ্জন একটু যা উঠলও—কতকটা সদয় সহিষ্ণুতার মধ্যে মিটেও গেল—'আহা, আসুন, একলা মানুষই তো?'

জনপাঁচেক স্ত্রীলোকের একটি দল। একজনের বয়স একটু কম, বাকি সবাই বর্ষীয়সীই বলা যায়, তার বয়সও কিছু বেশিই, প্রৌঢ়ত্ব প্রায় পেরিয়ে গেছে। রঘু চোখ তুলে দেখে নিয়ে বলল—'হ্যাঁ মা, একাই আমি।'

'বোস, ওখেনটায় থলেটা রেখে।'... একটু জায়গা দাও গোঁসাইকে। কোথা থেকে ডাক এল গোঁসাইয়ের?'

বুঝল না রঘু। তার বিমূঢ় ভাব দেখেই আর একজন বলল—'জগন্নাথের ডাক কাছির টানে, কাশীরাজের শিঙের, আমাদের রাধাবিনোদের ডাক মোহনবাঁশি—তা কোন্ ডাকে গোসাইকে ঘরছাড়া করলে—তাই জিজ্ঞেস করছেন মাসিমা।'

চকিতে সমস্ত মেলাটা একটা নূতন অর্থ নিয়ে দাঁড়াল রঘুর সামনে।' এতক্ষণ এদিকটা ভেবে দেখেনি। তীর্থ যাত্রীর মেলা একটা কথা খুব অস্পষ্ট-ভাবে মনে উদয় হচ্ছে যেন, সেটা স্পষ্ট করে নেওয়ার আগে উত্তরটা দিয়ে দিল—'আপনাদের কোন্ দিক থেকে?'

ওদের হেঁয়ালিতে বলাটা যে বুঝতে পেরেছে সেটা দেখাবার জন্ত অল্প একটু হেসেই বলল।

সেই স্ত্রীলোকটিই বলল—'পাঁচমিশেলী কাণ্ড—কাকে খুশী করি কাকে চটাই বলো? কাশী আছে, মথুরা-বৃন্দাবন আছে, তারপর এবার আবার প্রেয়াগে…কুম্ভ…'

অপর একজন একটা পুঁটলিতে গেরো দিতে দিতে বলল-'অত পুণ্যির জোর কি আছে?'

'কথাই তো।'—মাসি বলে পরিচিত স্ত্রীলোকটি ত্বদিকে ঘাড় হেলিয়ে খুঁজে নিয়ে ডান পাস থেকে একটা গুলের কৌটো টেনে নিল। একটু গুল মুখে দিয়ে বলল—'মানুষে সাধই করতে পারে, সাধ্যি কতটুকু বলো বাবা? তবে বেরিয়ে পড়েছি এইটুকুই বলতে পারি।…তা তুমি কোথায় যাবে?'

মাথাটা শুধু পরিষ্কারই হয়ে আসা নয়, ওদের কথাবার্তায় সময়ও পেয়েছে, রঘু খানিকটা হাতে রেখে বলল—'আমারও ঐ কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া মাসিমা—কুম্ভটুকু লক্ষ্য…"

'কিন্তু তার তো এখনও পক্ষকাল দেরি।

রঘু একটু চোখ তুলে ভাবল। বলল 'তাই নাকি?…ঠিক অত দেরি জানা ছিল না।…তাহলে…। দাঁড়ান আমি আগে চানটা সেরে আসি। আমার থলেটা এখানে রেখে যাই?'

"থাক না, সবাই তো রয়েছি।"

ব্যাগের মুখ খুলে ধুতি আর গামছা বের করে নিয়ে তালা এঁটে এগিয়েছে, মাসিমা প্রশ্ন করল—"তেল নিলে কৈ?"

'তেল? তেল আর সঙ্গে নিইনি। পৌঁছে তখন—"

'কেন? আমাদের তো রয়েছে, বাবা। দে তো জপা গোঁসাইকে একটু…'

"আবার…"

—হেসে মৃদু অনিচ্ছা জানাল রঘু।

'না, বড্ড যেন রুক্ষ দেখাচ্ছেও। ভালো করে তেল মেখে চান করে এসো।'

যে স্ত্রীলোকটি 'মাসিমা' বলে আরম্ভ করেছিল কথা, একটা বড় তেলের শিশি এগিয়ে ধরল। হাতে নিয়ে বেরুতে যাবে রঘু, মাসিমাই বলল—'তুমি বরং এখেনেই মেখে নাও—ঐ দেয়ালের কাছটায় দাঁড়িয়ে—তিথি যাত্রীদের

অত দেখলে চলে না। যেমন ভুলো, অন্যমনস্ক দেখছি, কলতলায় যদি ফেলে আস...”

‘তা মন্দ বলেননি। সারা রাত জেগে আসা...ভিড়...“অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে দোষ দেবেন কি করে ?”

কোণের দিকে চলে গিয়ে, জামা-র‍্যাপার নামিয়ে ভালো করে তেল মেখে আবার সব তুলে নিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

॥ উনিশ ॥

মনটা আবার ভেতরে ভেতরে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে রঘুর, যার জন্যে কিছুক্ষণ আলাদা হয়ে পড়া দরকার হয়ে পড়েছে, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করবার জন্য। তাছাড়া সত্যিই বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, কথার উত্তর দিতে দেরী হয়েছে, বেশ যে সুসংলগ্ন হয়েছে, এমনও নয়।

এবার মনের চঞ্চলতা অন্য কারণে, ওদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লে কেমন হয় ? তীর্থযাত্রী, তাও মেয়েদের দল, আত্মগোপন করবার এমন সুযোগ আর পাবে না। স্নানের জায়গাগুলায় ভিড়, আলাদা না হয়ে ভিড় দেখেই দাঁড়াবার একটা অভ্যাসই আপনি হয়ে গেছে এই দুদিনেই, একটা হালকা ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারিদিক থেকে ভেবে নিয়ে পুষ্ট করে নিল সংকল্পটা, তারপর ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরিয়ে গেল।

একটা সস্তা হোটেল দেখে ভালো করে স্নানাহার সেরে নিতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে এল। তীর্থযাত্রার কথাটা স্নানাহারের মধ্যে বরাবরই ভেবে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরে এল, কি করবে, কিভাবে প্রসঙ্গটা চালাবে তার মোটামুটি একটি খসড়া প্রস্তুত ওর। নিজেই আরম্ভ করল—“আহারটাও সেরেই এলাম মাসিমা, তাইতে দেরি হোল একটু। জিজ্ঞেস করছিলেন না—আমি কোথায় যাব ? তা আমার যাত্রাও তো কপালঠুকে বেরিয়ে পড়া। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ? বললেন কিনা—কুম্ভর এখন পক্ষকাল দেরি, তাই জিজ্ঞেস করছি।”

“আমরা ঠিক করেছি কাশীটা আগে সেরে নোব।” মাসিমা বলল—“সেখেনে বাবা যদ্দিন ঠাঁই দেন। তারপর মথুরো আর বৃন্দাবন। তারপর ঐ ললিতে যেমন বললে—থাকে কপালে, তখন কুম্ভ। তারপর তোমার গিয়ে...’

"একটা কথা বলি মাসিমা ?—একটু আগ্রহ দেখিয়েই ওর কথার পিঠে প্রশ্ন করল রঘু।

"কি বলবে বলো না, বাবা।"

"কপাল ঠুকে যেদিকে ঠাকুর টানেন বলে বেরুলেও মোটামুটি একটা তো নিতেই হয় ঠিক করে। তা দেখছি একরকম মিলেই যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে। তাই বলছিলাম যদি সঙ্গী করে—"

শুনতে শুনতেই একটি মৃদু হাসি ফুটে উঠছিল মাসির ঠোঁটে, ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"ঐ ছাখ গো ললিতে, বলছিলাম না ?—বেরিয়ে তো পড়ি যাদব দাসকে সঙ্গে করে, তারপর যিনি ডাক দিয়েছেন তিনিই করবেন ব্যবস্থা। তা, এই মিলিয়ে নে এবার।"

এরপর আবার রঘুর দিকেই চেয়ে বলল—'সঙ্গে নেবার কথা কি বলছ, বাবা ?—তোমাকেই তো কাণ্ডারী করে পাঠিয়েছেন রাধাবিনোদ। নইলে ঐ ছাখো না—এই হাটের মধ্যে নির্বিকার এককোণে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে—ঐ মনিষ্যির ভরসায় কি বেরোয় কেউ ? জানি, ডাক দেওয়ার আগেই তিনি ঠিক করে রেখেছেন নৌকো-মাঝি। তা তুমি আসছ কোত্থেকে ?"

"সেটাও আপনিই আগে বলুন না মাসিমা, দেখি ওটার মতন এ দিকটাও মেলে কিনা।"—একটু হেসে বেশ সহজ একটা কৌতুকের ভাব নিয়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

"আমরা আসছি সিউড়ি থেকে, বাবা। কাছাকাছি দুটি গ্রামের মানুষ, উঠেছি আমরা সিউড়ি ইষ্টিশনে। তুমি ?"

"ঐখেনটায় ঠিক মিলছে না, তা তাতে ক্ষেতিটেই বা কি ? আমি আসছি —আপনার গিয়ে বড় নদী পেরিয়ে গড়বেতার ওদিকে পাৎড়া গ্রাম থেকে—সমস্ত রাত গরুর গাড়ি—দূর তো কম নয়।..."

হোটেলের দুজন খদ্দেরের মুখে নাম দুটো শুনে এল এখনি। সুবিধে বুঝলে লাগিয়ে দেবে। জায়গায় প্রভেদটা যত বেশী হয় ততই ভালো।

মাসি বলল—"এমনই তো হয় বাবা, নৈলে সে চতুরের কেরামতিটে থাকে কোথায় ? ঘরের মানুষ নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে, দূরের মানুষ সেধে এসে বলবে—হাঁগা, সঙ্গী করে নেবে ? তা না হলে আর..."

"তা নাহলে আর লীলাময় বলেছে কেন ? লীলা খেলার যে কতরূপ শঠশিরোমণির !"

—সবারই দৃষ্টি এদিকে এসে পড়েছে। একজন একটা পুঁটুলির গেরো খুলতে খুলতে টিপ্পনী করল।

মাসি বলল—"তাই না তাই। মাঝখান থেকে আমরা নাকাল হই; ঐ ভাখো না, এতোতেও সাড়া নেই মনিষ্যির।…তা, তুমি ঘুমোও গে নাক ডাকিয়ে, আমরা পেয়ে গেছি।…তবে তুমি শুধু সঙ্গী হয়েই থাকবে কেন বাবা, কি দুঃখে? যেমন মাসিমা বলে এসেছ তেমনি বোনপোটি হয়েই থাকবে। আর, ও হোটেল-টোটেলই বা কেন?' পথেঘাটে ওসব ভালোও তো নয়। বাসি,—ভেজালের জায়গা—একটা কিছু হয়ে পড়তে কতক্ষণ? তখন কে দেখছে? আমাদের সঙ্গে চিড়ে, মুড়কি, ওলা রয়েছে, কলা কিনে নিলাম, একটু দই পাই ভালো, না পাই, জলআছড়া দিয়েই খুন্নিবিত্তি। দু'দলা খাবে আমাদের সঙ্গে। পথের ফলার, নিদ্দোষ।'

"গোঁসাইয়ের রুচবে কি?"—জপা বলে স্ত্রীলোকটি বলল।"

"কেন?"—মাসি প্রশ্ন করতে "তাই বলছি।"—বলে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল।

মাসি একটু আলাদাভাবে রঘুকে দেখে নিয়ে বলল—"ও বুঝেছি!…তা এ ব্যবস্থা তো পথের জন্যেই, বলো? এক জায়গায় থিতু হয়ে বসলে তখনও কি চিঁড়েমুড়কিই? তখন আবার অন্য ব্যবস্থা—ঐ হাঁড়ি, তসলা, বোকনো—সবই রয়েছে তার জন্যে। না, সে জন্যে তুমি ভেবো না বাবা, তোমার ব্যবস্থা তোমার মতই হবে; থাকো তুমি আমাদের সঙ্গে।"

ললিতা বলল—আর শুধু মেয়েদের দলই নয়তো। একজন পুরুষও রয়েছে। যাই হোক, দুটো ভাল-মন্দ কথাও তো বলতে পারবে।…বলি, দাসমশাই! উঠুন, আর কত ঘুমুবেন?"

রঘু বলল—"থাক, ওঁকে ঘুমুতে দিন। যখন উঠবেন আলাপ হবে।…মনে হচ্ছে আপনি ভেবে নিয়েছেন, খাওয়া নিয়েই আমার যত মাথাব্যথা। মা-মাসির হাত থেকে চিঁড়ে-মুড়কি, সে তো অমৃত, তারপর যদি দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে "

"তুমি থাকো বাবা, আর দ্বিমত করো না। ঐ যে বললাম না? যেমন মাসি বলে এসেছ তেমনি বোনপো হয়ে থাকবে। তাহলে তোমায় সবার পরিচে করিয়ে দিই। এ হল জপা, ভালো নাম জপমালা; আমার ননদ; এ ললিতা, আমার দূর সম্পর্কের বোন। এই হলুম আমরা তিনজন এক গ্রামের। মেয়ের

দিকে। যাদবদাসও আমাদের গ্রামেরই। সব্বারই কাকা—গ্রাম সম্পর্কে এক একজন যেমন দাঁড়িয়ে যায় না ?—বাপের কাকা, সে ছেলের কাকা, আবার নাতিরও কাকা…"—একটু হাসল।

ললিতা বলল—"শুধু একজন ছাড়া।"

জপা ওদিকে ঘুরে কি একটা গোছাচ্ছিল, মাসি তার দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"ওর কথা বাদ দেও।" রঘুকে বলল—"তুমিও কাকাই বলে ডাকবে। মাসির কাকা বলে যে দাদামশাই বলতে হবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি নেই। ওকে নিয়ে এই হল চারজন আমাদের গ্রামের, নাম শ্রীনিবাস। ওরা দুজন পাশের গ্রামের। ওর নাম হরিমতি, পাশেরটির নাম তমাল, ওরা দুজন বোন—পিসতুতো-মামাতো। এই হল আমাদের লোকের পরচে বাবা। আর কি পরচে দেওয়ার আছে ?—বল্‌না গো তমাল।"

"আসল পরচেই তো দিলে না, যেখানে হয়তো গোঁসাইয়ের আটকাতেও পারে।"

"কি বাকি রইল ?"—একটু উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল মাসি।

"কি জাত-ধম্ম তা বলেছ ?"

"ও! হ্যাঁ, তাও তো বটে।…তা আমাদের না হয় মানা—নিজেদের খেতে। যে খায়—তার জন্যে—বিশেষ করে পথেঘাটে…"

"বুঝেছি মাসিমা, আর বলতে হবে না।"—রঘু থামিয়ে দিয়ে বলল,—'তা ওখানও যে আপনাদের সঙ্গে মিল রয়েছে—সে কথাও বলবই মনে করছিলাম। আমিও বোষ্টমই। আপনাদের সবার মতন কণ্ঠী নেই গলায়, কিন্তু আমিষাহার ?—রাধামাধব-ও সবের নাম করাও বারণ আমাদের।

—জিভ কাটল। বলল—"এই সিদিন সুতোটা পুরনো ছিল—নদীতে চান করতে গিয়ে ছিঁড়ে তলিয়ে গেল। অস্বস্তিই বোধ হচ্ছে—একটা আবার ধারণ না করা পর্যন্ত। আপনাদের কাছে আছে নিশ্চয় ব্যবস্থা ?"

"থাকবে না বাবা ? পথে কখন কি হয়।·· জপা, দোতো বোন···তোমার নাম, বাবা ?

"আমার নাম উদ্ধব মাসিমা।"

"বেশ মিষ্টি নাম, উদ্ধব হলেন কৃষ্ণসখা। আমাদেরও সবার বোষ্টম কেতাতেই নাম রাখা বাবা। এদের শুনলেই, আমার নামও কুঞ্জবালা।"

নিজের মিষ্টি নামটা বলে কুণ্ঠিত হয়ে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল—

"বেশ ভালো হোল। সবদিক দিয়েই মিল। এবার আমাদের সঙ্গে কিছু একটু খাবে বাবা? না, খেয়ে এসে খুবই অন্যায় করছ, একথা আমি বলবই।"

"পেটে আর জায়গা তো নেই, মাসিমা, ক্ষিদের মুখে খাওয়া তবে পেসাদ পাওয়ারও তো লোভ হচ্ছে—ছোট্ট একটা দলা…"

"আহা, দে গো তমু। তোমাদের আবার ক্ষিদে-অক্ষিদে। এই তো খাওয়ার বয়স তোমার বাবা।"

দুটো বড় থালায় করে চিঁড়ে-মুড়কি-দই-কলা মাখাই হচ্ছিল, একটা পাথরের বাটিতে করে খানিকটা এগিয়ে দিল তমাল বলে স্ত্রীলোকটি।

॥ কুড়ি ॥

বেশ ভালো হোল; সবদিক দিয়ে মিল। এত মিল কল্পনাও করতে পারেনি রঘু। খানিকটা দৈবই, তবে ওরও বেশ বুদ্ধি জুগিয়ে যেতে লাগল, দৈববলে যে সুযোগটা পেল সেটা পরিপূর্ণ করে নেওয়ার, নাম থেকে একেবারে কণ্ঠের তুলসীমালা পর্যন্ত।

দশদিন পরের কথা। দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যার সময় একটু নিরিবিলি বেছে নিয়ে একা বসেছিল রঘু। প্রায় এসে বসে এ সময়টাতে। একটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বোধ যা পাকিস্তান ছাড়া অবধি কোথাও পায়নি—উকিল-মনিবের বাড়িতে যে অতটা নিশ্চিন্ত পরিবেশের মধ্যে ছিল, সেখানেও নয়। আর কিছু না হোক, সে তো কলকাতাই, বাংলাদেশই।

ফলেও তো গেল। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বামনদাস-কে চাপ্ দেয়ই—"ব'লে ঘুরে চাইলেই আজ রঘু কোথায়?"

আর, এখন ও সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষই। নতুন সঙ্গী, নতুন পরিবেশ, সব কিছুর সঙ্গে এত মিল যে, যেন নিজেকে নিজেই চিনতে পারে না। বোষ্টম, গলায় তুলসীমালা, ওদের মতো তিলকসেবাও করে, রয়েছে নাকে, কানে, কপালে, একটু বেশী ঘটাই। আরও মিল আসবে, যাদবদাসের মতো একেবারে মাথা পর্যন্ত মুড়িয়ে একটা টিকি রাখবে ফুল বাঁধবার জন্যে। মাথার মাঝখানে নয়, ঘাড়ের কাছে, গলায় জড়ানো তিন-কেতা তুলসীমালার নীচে চেপে। তাই করতেই যাচ্ছিলও, যাদবদাসকে বলেওছিল, জপা বলে স্ত্রীলোকটি কাছে ছিল,

শুনে এমন খিল খিল করে হেসে উঠল, তখনই আর হোল না। যাদবদাসও বলল—এই কাশীর শীতে হঠাৎ এমন করে একেবারে নেড়া হয়ে গেলে—একমাথা বড় বড় চুল রয়েছে বেশ—ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

কিন্তু হবেই নেড়া রঘু। কে হাসল, কি মাথায় একটু ঠাণ্ডা লাগল, অত ভাবলে চলবে না। জীবনের ও-দিকটা একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে একেবারে একটা নতুন জীবন আরম্ভ করবে সে—নামে, চেহারায়, ধর্মে, বেশভূষায়। গায়ের হালকা পাঁশুটে রঙের ব্যাপারটা গেরুয়ায় ছুবিয়ে নিয়েছে। একটা ছোট পাগড়ি গোছের কিনেছেও, মাথায় ঠাণ্ডা তাইতেই রুখবে। না হয় একটা কানঢাকা বাবাজী-টুপি কিনে নেবে, আর এক দফা পর্দা টেনে দেওয়া বাইরের দৃষ্টি থেকে।

জপা মেয়েটা প্রগলভা। কাউকে বাদ দেয় না, কেউ ধরে না ওর কথা। যাদবদাস তো ওর নামই দিয়েছে 'পাগলী বেটি।'

দলের মধ্যে ওই একা যাদবদাসকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করে। একদিন ঐ আলোচনার মধ্যে রঘুকে সাক্ষী মেনে বলল—"আপনিই বলুন গোঁসাই, এতগুলো মেয়ের মধ্যে একজন পুরুষ, তাকে কাকা বলি, তারপর যদি মুখ ফসকে কিছু বেরিয়ে যায়, তখন আবার প্রাশ্চিত্তির করো। এ বেশ আছি। আমার আবার বলা মুখ। চুলকোয়।"

তমাল বলল—'তা ব'লে ভাজ বলবে কাকা, ননদ বলবে 'দাদু ?"

জপমালা বলল—"ননদ দাদু বলছে দেখেও ভাজ যদি কাকাই ধরে থাকে তো আমি কি করবো ? আসল কথা আমি তমাল বড় ভালবাসি। দেখিনি কখনও, তবে শুনেছি নাকি মিশ কালো—শ্রীরাধিকে তাই ভালবাসতেন। আমাদের তমালমণি রয়েছেন, কিন্তু একেবারে কাঞ্চনবর্ণা, দেখছেনই, কাজেই আমি দাদুকে দেখে চোখ জুড়োই। অন্যায় করি ?"

একটা টেপা হাসি খেলে যায় সবার ঠোঁটে। যাদবদাস খসখসে কালো, লম্বা, হাড় কাঠ মোটা, গাঁজা খায়, চোখ দুটো লাল তার ওপর নেড়ামাথায় ঘাড়ের কাছে টিকি।

ভাজ কুঞ্জবালা বলল—"তোমার তমাল গাছ নিয়ে তুমিই থাকো। বাবাঃ!" আবার বলে—চোখ জুড়োয়!

জপমালা বলল—"তাই আছি। তোমরা কেউ নজর দিও না।'

একেবারে ফুকরে হেসে উঠল সবাই।

বেশ লাগছে রঘুর। বেশ মিষ্ট স্বভাব সবার, জাতবোষ্টমদের মধ্যে যেটা এর আগেও লক্ষ্য করেছে; এর আগে যে-কজনকে দেখেছে। মিষ্ট সরল, খোলা মন। এক জপমালা ছাড়া সবাই বর্ষীয়সী। কুঞ্জবালা তো প্রবীণাই, তাই চারদিক থেকেই তার ওপর যেন একটি ব্যথাতুর-বাৎসল্যের ধারা নেমে আসতে থাকে।

যাদবদাস লোকটা একটা জড়পিণ্ড; খায়দায়, ঘুমোয়, সময়ে সময়ে গাঁজা টানে। গায়ে শক্তি আছে, কিন্তু স্ফূর্তি নেই। ওর শক্তিটা কাজে লাগে মোট বইতে, যখন ওরা ঠাঁইনাড়া হয়। থালা-বাসন আর সবার হালকা বিছানাপত্র একত্র করে যে মোটটা হয় সেটা বয়ে নিয়ে যায় যাদব দাসই।

গাঁজার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে নানা রকমের স্বপ্ন রূপ নেয়। যাদব দাসের স্বপ্ন—হঠাৎ অনেক সম্পত্তি পেয়ে হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে যাওয়া—লটারিতে, গুপ্তধনে, পথ চলতে হঠাৎ কিছু একটা পেয়ে গিয়ে। টাকা-মোহর নয়, একেবারে হীরে-মানিক। পাবেই। রঘুর সঙ্গে গল্প প্রসঙ্গে বলে। হাত দেখিয়েছে। সবাই ঐ কথাই বলে।

কেনা-কাটা, বাসার ব্যবস্থা সব কুঞ্জবালার হাতে। চৌকোশ স্ত্রীলোক। তীর্থ বেশ ঘাঁটা আছে, পথ চেনে, লোক বোঝে। এককথায় বলতে গেলে সমস্ত দলটাকে ওই চালিয়ে নিয়ে যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের খানিকটা দূরে প্রতিদিনের ভাড়া হিসাবে দুটো ছোট-বড় ঘর নিয়েছে। বড়টাতে ওরা মেয়েরা থাকে, ছোটটাতে রঘু আর যাদবদাস। রান্নার জন্যে ছোট একটি বারান্দা আছে। তাইতে রান্না হয়। কুটনো-বাটনা-রান্না সবাই মিলে সেরে নেয়। এরপর খেয়েদেয়ে একটু এদিক-ওদিক করে মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ে সবাই, দূরে কাছে। যাদবদাস বাইরের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোয়। রঘু থাকে দলের মধ্যে। এদিক দিয়েও একটা বড় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে রঘুর মধ্যে, যদিও ঠিক সজ্ঞানে বা সচেষ্ট ভাবে নয়। ওর জীবনটা যেন দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে নিয়ে পাকিস্থান পর্যন্ত যে অংশ সেটা আস্তে আস্তে আবছা হতে হতে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বেচারাম নিজেদের কলুষিত জীবন নিয়ে যখন বলে—"কয়লা হাজার ধুলেও রং বদলায় না, রঘু উত্তর দেয়—কিন্তু পুড়লে বদলায় রং বেচু!"

ওর পরিবর্তনটা সেই পুড়ে রং বদলানো।

এটা একটু স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছিল কলকাতায় উকিল-মনিবের বাড়িতে থাকতে, গিন্নির ধর্মভাবের ছোঁয়াচ লেগে। কালীঘাট তো তাঁর ছিলই, তাছাড়া, মঠে-মন্দিরে কিছু হলে প্রায় যেতেনই তিনি। রঘু প্রায় থাকতই। একদিন দক্ষিণেশ্বরও হয়ে এল ওঁদের সঙ্গে। টের পায়নি, তবে রংটা ভেতরে ভেতরে আসছিলই ধরে। কাশীতে এসে সেটা অনেকটা আত্মপ্রকাশ করল। কলকাতায় ছিল চাকরির একটা অঙ্গ, তবে মাত্র 'মন্দ-না-লাগা'; এখানে তীর্থধর্ম নিয়েই থাকা, এই ক'টি প্রাণীর সংস্রবে সেই জিনিসটা স্পষ্ট 'ভালোলাগায়' পরিণত হয়েছে। সেদিন পলাতকের আতঙ্ক নিয়ে এদের আশ্রয় নিয়েছিল, আজ নিশ্চিন্ততার মধ্যে এদের মুক্ত জীবনের স্পর্শে মনে হচ্ছে, একটা অশেষ দুঃখের মধ্যে দিয়ে একটা সুস্থ, মুক্ত জীবনের সুযোগ এসেছে হাতে।

ওরা বেরুবার সময় গোড়ায় কয়েকদিন ছেড়ে ছেড়ে আহারের পর আলস্যের জন্য সঙ্গে নেওয়া বাদই দিয়েছিল, আজকাল যদি কুঞ্জবালা বা অন্য কেউ বলেও—'বেটাছেলে অত পারবে কেন, অনেকদূর আজ'—রঘুকে নিরস্ত করা যায় না। ওর কথার মধ্যেও ওদের কথা বলার ভঙ্গি এসে পড়ে আজকাল কখনও কখনও। দূরের জন্য একদিন কুঞ্জবালা বারণ করতে বলল—যত দূর, বাঁশীর সুর তো ততই জোরালো, মাসিমা।"

কয়লার রং বদলাচ্ছে।

দশাশ্বমেধের ঘাটের নিরিবিলিতে এসে ও মাঝে মাঝে মনটা গুছিয়ে নেয়। সংকল্পকে দৃঢ় করে। এটা হয় যেদিন হঠাৎ তেমনি কিছু হয়ে বা তেমনি কিছু কথা শুনে একটা চমক লাগে মনে। হয়তো কয়লাটা একটু নিভে আসছে, নতুন স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে আবার দীপ্ত হয়ে ওঠে।

সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু ওদের কারুর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কখনও কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি রঘু। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ায় আর কারুর বাইরে যাওয়া হল না। শীতের বৃষ্টি সবাই মেয়েদের ঘরে আগুন জেলে চারিদিকে ঘিরে বসে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ল, এই রকম ঘরের কোণ-খোঁজা আবহাওয়ায় যেমন হয়। বিষণ্ন আবার তারই মধ্যে যেন বৈরাগ্যে মুক্ত শুধু একজনকে আত্মনিবেদন করে জাতবোষ্টমদের যেমন হয় মনের ভাব।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প, অনেক কথা জানল রঘু। জানল কুঞ্জবালা, তমাল

আর হরিমতি রীতিমতো গৃহস্থ বোষ্টম। তমাল আর হরিমতির স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, খেত-খামার, গরু বলদ আছে। জানল ললিতাও তাই, তবে বিধবা। কম বয়সেই হয় বিধবা। মালাবদল করে নতুন সংসার পাততে কোনও বাধাই ছিল না, তবে পাততে চায়নি। একটি মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে নিজের কাছেই এনে রেখেছে। সেই দেখাশোনা করে সব। ও প্রায় ঘুরে ঘুরেই বেড়ায়, কুঞ্জবালা একটা হুজুগ তুললেই হল। কুঞ্জবালারা ননদ-ভাজে একেবারেই ষোলআনা বোষ্টম। কুঞ্জবালা দুবার মালাবদল করে। দ্বিতীয়বার প্রথম বারেরটি থাকতেই—ছাড়াছাড়ি করে। সেটি মারা যায়। আর করেনি। একটি ছোট মঠের মতো আছে গ্রামে। কিছু ভূসম্পত্তি। বিগ্রহ রাধা-বিনোদ। তাঁর সেবা নিয়ে থাকে দুজনে।

একদিন বলল—"আমার ঘর বাঁধা রাস্তায়, বাবা; টেকল না, ঢেঁকবার নয়। ছেড়ে দিয়েছি।"

বিষণ্ণ, বৈরাগ্যপূর্ণ, অথচ সরস; মাঝে মাঝে হাসি, তামাসাও পড়ছে এসে।

জপমালা একরকম মুখ বুজেঁই ছিল। কথাটা ভাজ কুঞ্জবালাই তুলল, বলল—"এখন জপুসুন্দরী কি করেন দেখা যাক। একটি তো হয়ে গেছে, পটলো না।

অন্যমনস্ক ছিল জপমালা, বলে উঠল,—"রক্ষে করো বাবা, জপুসুন্দরীর একটিতেই সাধ মিটে গেছে জন্মের মতন!"

এমন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে আতঙ্কের ভঙ্গিতে বলল যে, সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল।

এক ও নিজে ছাড়া। রঘুর দিকেই চেয়ে বলল—"দেখলুম, শুধু মাটির দেহটা নিয়ে টানাটানি, গোঁসাই। আমি আর ও পাঠ পড়ি?'

কপালে হাত দুটো জড়ো করে দুধারে সরিয়ে নিল। বললও বেশ স্পষ্ট, নিঃস্কোচ দৃষ্টি রঘুর মুখের ওপর তুলে রেখে।

॥ একুশ ॥

জপমালার হঠাৎ শিউরে উঠে বলার ভঙ্গিতে রঘুও না হেসে উঠে পারেনি অত নিঃসঙ্কোচে, একজন পুরুষ মানুষের মুখের ওপর স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলে বলতে পারল কি করে ভেবে বিস্মিতও কম হয়নি। এখন কিন্তু ঘাটের নিভৃতে তীর্থ-

পরিবেশের মধ্যে তার সব কথার মধ্যে মাত্র একটি কথাই চয়ন করে নিয়ে মনে মনে আওড়াচ্ছিল রঘু, 'এই মাটির দেহটা নিয়ে টানাটানি'…সত্যই কি দরকার? অনেক তো দেখল এই বয়সে—কিছু নেই…

শরীরের ওপর একটা অবহেলা এসে গেছে। দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল ছেড়েই দিয়েছে।, বেড়ে যাক। আত্মগোপনের একটা উপায় হিসাবেই, তবে বৈরাগ্যের ভাবটাই যেন বেশি, ক্রমে যেন সেইটাই আসল হয়ে উঠছে। এমনকি, বৈরাগ্যের একতারাটা যখন বেশি করে ঝনঝনিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে, যেন ভেতরে কার দ্রুত অঙ্গুলীস্পর্শেই—তখন মনে হয় পড়লই বা ধরা—মৃত্যু আজীবন কারাবাসই তো? তা, এই নিত্য সভয় মুক্তি থেকে মন্দ কিসে?

এক একদিন নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মনটা যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

টেনে রাখে এদের সঙ্গ। সত্যই বড় স্নিগ্ধ-সরস, নির্দোষভাবে সরস। এদের বিচ্ছেদের ভয় হয়, একদিন তো এরা গৃহমুখী হবেই। তখন তো নিজের বৈরাগ্যই থাকবে সঙ্গী। তার জন্যে প্রস্তুত করে যাচ্ছে নিজেকে রঘু।

কুম্ভটা ওরা বাদই দিল। যাবে না। ওটা ছিল একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত দিনের আকর্ষণ, ওটা বাদ দিয়ে ওদের স্থিতি-গতি আরও মুক্ত হয়ে উঠল। বোষ্টম হলেও, নিবিড়ভাবে একদেবতার সাধিকা হলেও, ওদের মন সেদিক দিয়েও বাঁধন-ছাড়া। দেবতা নিয়ে বাদ-বিচার নেই, কোনও গোঁড়ামি নেই—তীর্থে তীর্থে ঘুরে যেন সব দেবতার মধ্যে ওদের সেই এক দেবতাকে খুঁজে বেড়ায়।

কুম্ভ বাদ দিয়ে কাশীতেই দিন পনেরো থাকল। তারপর সারনাথ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা—সব জায়গাতেই চার-পাঁচ দিন করে। যখন প্রয়াগে এল তখন কুম্ভের মেলার আর কিছুই অবশেষ নেই।

প্রয়াগেও ওরা বেশিদিন রইল না। বড় তীর্থই তবে প্রধানতঃ স্নানতীর্থ। একটু একটু শীতের আমেজ তখনও রয়েছে, তাছাড়া কাছাকাছি এসে ওদের বোষ্টমতীর্থ মথুরা-বৃন্দাবনের টান ধরেছে। এখানে দিনসাতেক কাটিয়ে ওরা শীত একরকম শেষ করেই মথুরা সেরে বৃন্দাবনে এসে আড্ডা গাড়ল।

এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যেন বড় রকমের পরিবর্তন এসে পড়ল সমস্ত দলটির মধ্যে; একটা রূপান্তরই যেন। অনেকগুলো কারণ হল, তার মধ্যে সবচেয়ে যা বিশিষ্ট তা এই যে, ওরা নিজেদের তীর্থে এসে পড়েছে, আর

ওদের আসার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বসন্তকাল। এতদিন উত্তরপ্রদেশের শীতে যে একটা আড়ষ্টতা থাকতই জড়িয়ে দেহমনে, সেটা কমে গিয়ে সব কিছুই আরও যেন সাবলীল হয়ে উঠেছে—ওঠাবসা, যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়ানো মঠ-মন্দির দেখে দেখে, কীর্তন-কথকতা শুনে শুনে, এমনকি কীর্তনে যোগ দিয়েও; অপরিচিত বলে যা ওরা ওদিকে করত না, যদি না হোল কোনখানে। হোতও কম ওদিকে। ভাষাতেও একটা রূপান্তর। এখানে প্রচুর স্বজাতি, প্রচুর নিজের ভাষায় কথা বলা। পরিচয় না থাক, অপরিচয়ের বাধাও নেই। সবাই বোষ্টম, ভাষার সঙ্গে মনের দিক দিয়ে সবাই এক, একটা অবিচ্ছিন্ন উৎসবের মধ্যে, মুক্ত করে দিল সবাই নিজেদের। এমনকি, অমন যে জড়পিণ্ড যাদবদাস সেও যেন একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঘুম কমেছে, গাঁজা বেড়েছে, যা আলস্য-জড়তার জন্যেই অনেক সময় হয়ে উঠত না। ঘোরাঘুরি করে, গল্পও করে বেশি, বিশেষ ক'রে রঘুর সঙ্গে। অনেক সময় তাকে ডেকে কাছে বসিয়েই। আগে যেখানে ওকে ডেকেই পাওয়া যেত না।

এইরকম আর অনেক কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস খুব বেড়ে উঠেছে যাদবদাসের—ওর সেই কিছু-পেয়ে-গিয়ে হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন বা বিশ্বাসটা।

"শুনছ উদ্ধব, এবার গোবিন্দজীর ইচ্ছেয় একটা কিছু না হয়েই পারে না; এই বৃন্দাবনে থাকতে থাকতেই। দেখে নিও তুমি। রোজ গিয়ে মন্দিরে ধরণা দিচ্ছি, অমনি নাকি? দেখে নিও তুমি।"

রঘু হয়তো বলল—তার নিজের মনের রং বদলে আসার জন্যেই—"আর এখানে এসেও ঐ কথাই ভাববেন কাকা? সবাই যেখানে নিজেদের সর্বস্ব ছেড়েই আসছে।"

"এই দ্যাখো উদ্ধবের কথা! আমিই কি আঁকড়ে ধরে থাকব ভেবেছ নাকি? রাম বলো। তবে, ছাড়ার আগে পাওয়াটা তো দরকার, নৈলে ছাড়বোটা কি বলো? লালাবাবুর ছিল বলেই না তিনি বাসনায় আগুন দিয়ে বেরিয়ে এলেন। না থাকলে আগুন দেওয়ার মতন থাকত কি সেইটে বুঝিয়ে বলো আমায়।"

একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে সোজা ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে চঞ্চলভাবেই গাঁজার ছিলিমটা সেজে রকে এসে রঘুর পাশে বসল, দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—"ভাইপো, বলো থাবে?"—ঘুরে চাইল রাঙা চোখ দুটো বড় করে।

শরীরটা তেমন ভালো ছিল না বলে রঘু আজ দলের সঙ্গে যায়নি। একাই বসেছিল বাড়িতে। যাদবদাসের মুখে এ ধরনের নিমন্ত্রণ নতুন নয়, ঘুরে দেখে প্রশ্ন করল—"কি আনলেন আজ কাকা?

যাদবদাস বলল—বলবে, তবে তো আনবো গো। এবার একটা ভোজ। পাশের ওদেরও বলতে হবে, একসঙ্গে রয়েছি যখন। তোমরা বিশ্বাস কর না, আমার নম্বরের ঠিক চারটে নম্বর এগিয়ে—একেবারে দেড়লাখ টাকা! সেকেণ্ড প্রাইজ। তবু বলতে হবে, এত যে ধরনা দিচ্ছি, ব্যাগ্যতা করছি, কানে তালা দিয়ে বসে আছেন গোবিন্দজী? বাজারে হৈ হৈ--তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছ, ভাইপো। অত করে বলছি, কিনে ফেলো একটা টিকিট ·· বল্, পড়িইনি কি এসে কাছাকাছি? মাত্র তো চারটে নম্বর বাকি!'

ছিলিমে আরও গোটাকতক টান দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

ও-ও বেরিয়ে গেছে, জপমালা হাসির সঙ্গে একটু শাসানি মিশিয়ে বলতে বলতে ঢুকল--"তুমি এবার ঠিক পাগল হয়ে যাবে বুড়ো—গেলে বলে পাগল হয়ে—আর দেরি নেই!"

নিজের মনেই মাথাটা একটু হেঁট করে বলতে বলতে আসছিল, রঘুর ওপর নজর পড়তে বলল—"কি আজগুবি খেয়াল বলুন তো গোঁসাই!—ও প্রাইজের কাছাকাছি এসে গেল, আর দেরি নেই? ওকে ভালোয় ভালোয় বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে যেন বাঁচা যায়—বৌদির যেমন কাণ্ড—একটা উদম পাগলকে সঙ্গে নিয়ে..."

এক ঝোঁকে বলে গিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে, কণ্ঠে একটু তিরস্কারেরই টোন এনে বলল—"তা আপনি এখনও ঠায় রকে বসে আছেন? শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে সঙ্গে গেলেন না, দোরসার সময় এটা—সন্ধ্যে হয়ে এল—না, বাপু আপনাদের বেটাছেলেদের সবারই একটা করে—কি বলব?···"

'জ্বরের মত কিছু নয়, শুধু···' রঘু আরম্ভ করেছে, "হতে কতক্ষণ?"··· —বলেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল জপমালা। বলল—'দাদুর যেমন নম্বর এগিয়ে এসেছে, আর চারটে এসে পড়তে কতক্ষণ?···'

হাসতে হাসতেই ভেতরে চলে গিয়ে বলল—'না, ছেলেমানুষী নয়, উঠে আসুন, আমি বরং আদার রস দিয়ে একটু চা করে দিই—নিয়ে এলাম আদা।'

'শেষ হয়ে গেছে পালা? ওঁরা এলেন না যে?'

"খুশি ও'দের। না, হয়নি শেষ এখনও। তবে হয়ে এল। আমার কেমন ভালো লাগছিল না। ঘ্যানর ঘ্যানর! শেষ যখন হয়ে এসেছে, শেষ করেই দে, না, সেই এককথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। আপনি উঠে আসুন গোঁসাই। আমি সন্ধ্যেটা দিয়ে স্টোভ জ্বেলে চা চড়িয়ে দিই।'

॥ বাইশ ॥

এক এক তীর্থের এক একরকম সুর। মূল দেবতা যিনি তীর্থপতি, তাঁর প্রভাবটাই বেশি করে এসে পড়ে মনের ওপর। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে বৈরাগ্যের ভাবটাই প্রবল হয়ে উঠত রঘুর, এমনকি, আত্মসমর্পণের জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করে তুলত কখনও কখনও, এখানে যেন অন্যরকম।

এখানে ভোগতৃষা বলতে যা বোঝায় তা হয়তো নেই, তার যাজ্ঞাও নেই দেবতার কাছে, তবে একেবারে ভস্মলিপ্ত বৈরাগ্যও নেই। কথকতা শোনে, কীর্তন শোনে, পালা শোনে, সবখানেই সেই এক সুর দেবতাকেই ঘিরে পাওয়া জীবনের যত মধু, তারপর সেই মধু তাঁকেই সমর্পণ করে দেওয়া। প্রথমে ঠিক বুঝত না, এখন যেন বোঝে; শুনে শুনে, আলোচনায় আলোচনায়। জিনিসটা যেন বৃন্দাবনের বাতাসে মিশিয়ে রয়েছে নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে গিয়ে একটা কিরকম আধশোনা সুর ঘনিয়ে তোলে।

বারাণসীর মতো কোনও এক জায়গায় নিরিবিলি দেখে বসে থাকে না রঘু; ঋতুটা অনুকূল, ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে বেড়ায়—তার যেন আছেও বেশি এখানে, মনের সঙ্গে মিলিয়ে। এক একদিন কিছু দেখে বা শুনে সেই অবুঝ ব্যাকুলতাটুকু বেশি নিবিড় হয়ে উঠল, কিম্বা একা ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি-অবসাদ এসে পড়ল দেহে মনে, রঘু বাসাতেই চলে আসে। দলের সঙ্গে গেল তো একটা কিছু অজুহাত দেখিয়ে। কিছু না পেল তো শরীর ম্যাজম্যাজ করা তো আছেই।

একদিনের কথা।

সেদিনও এসেছে চলে অনেক আগে-ভাগে। সেদিন ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তি নয়, একটা যে পালা শুনছিল তার মধ্যেও এমন বিশেষ কিছু ছিল না, তবু মনটা অহেতুকভাবে অন্তর্মুখী করে তুলল। নিজের জীবনের অতীত,

তার ব্যর্থতা, পালা শোনার মধ্যে এসে এসে পড়ে বাধা ঘটাচ্ছিল। এক সময় উঠে এল ; ঐ ব্যর্থতার বিষণ্ণতা মনে নিয়ে। এদের সঙ্গে থেকে পান খাওয়া একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে ; একটা সেজে নিয়ে রকে এসে বসল রঘু। পানটা মুখে পুরে দিয়ে অলসভাবে চিবানোর সঙ্গে স্মৃতি-মন্থন। গ্রাম—পাকিস্থান—হোটেলের চাকরি—শিয়ালদার বস্তি, মানদাদাসী, মেয়ে বলে পরিচয় দেওয়া মেয়েটা—খিদিরপুর—কালীঘাট…মনটা ঘুরে এসে বস্তিতে আটকে গেল, মেয়েটাকে ঘিরে, তার নামটা ছিল মুক্ত। মুক্তর সঙ্গে ঘর বাঁধার কথাটা উঠেছিল…

হঠাৎ কি হল, জপমালার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্মৃতিই, তবে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য এত স্পষ্ট যে, একদৃষ্টে শূন্যপথে চেয়েই রইল রঘু, আরও স্পষ্ট করে নেওয়ার জন্যে। যেন পেয়েই যাওয়ার, সব সমস্যা মিটে যাওয়ার একটা উল্লাস ভেতরে। সেটা অবশ্য রইল না, একটা উচ্ছ্বাসের মতো এসে তখনই মিলিয়ে গেল। তবে একটা মিষ্ট চিন্তা, জিভের মিষ্ট স্বাদের মতো মনে রইল লেগে। জপমালাকে নিয়ে ঘর পাতলে কেমন হয় ? যতই ওকে ঘিরে চিন্তাটা স্বপ্নালু হয়ে উঠছে—এমনভাবে আগে কখনও হয়নিও—ততই জপমালা যেন নূতনরূপে ফুটে ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে, বৃন্দাবনের যা আসল রূপ সেটা এত সবার মধ্যে খুলেছে, সবচেয়ে বেশি করে ওর মধ্যেই। জপমালাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে মনে হয়, ও যেমন কিছুই চায় না, তেমনি আবার কিছু ছেড়েও দেয় না। এরকম নির্লিপ্ত মানুষের মনের রহস্যের সন্ধান পাওয়া শক্ত। তবে নারী যতই রহস্যময়ী তার আকর্ষণটা ততই প্রবল। সব বুঝেও মনটা আবার ঘুরে-ফিরে ওর দিকেই যাচ্ছে এগিয়ে। সেদিন যে জপমালা শিউরে বলে উঠল—একটিতেই তার আশ মিটে গেছে, সেটা কি সত্যিই ওর মনের একেবারে গভীরের কথা ? তাহলে, কত গভীরের ? প্রায় দুমাস কাটল ওদের এখানে। এই দুমাসে জপমালার দৃষ্টিতে, কথায়—রঘুর সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময়ে, কথায়, এমন কিছু কি প্রকাশ পায়নি যা ঠিক ওর সেই 'সাধ মিটে যাওয়ার' সঙ্গে মেলে না ? কিম্বা, সে সবই ওর সেই সরল, মুক্ত মন, ওর স্বভাবমাত্র ?

আগে অত ভাবেনি, এসেছে মনে চলেও গেছে ; আজ সেইসব খুঁজে খুঁজে অর্থ বের করবার চেষ্টা করতে লাগল রঘু।

ছটফট করছে মনটা। সত্ত সত্ত একবার দেখতে ইচ্ছে করছে জপমালাকে ;

পালা শুনতে শুনতে রাধাকৃষ্ণ আর সখীদের সরস চতুর রহস্যালাপে ওর চোক নাচানো, সরস কৌতুকে, ওর মৃদু মৃদু হাসি—একবার ওকে এ-রূপে না দেখলে যেন চলছে না।

উঠে পড়ল রঘু।

কিছুটা যেতেই দেখল ওরা ফিরে আসছে ; পালা নিশ্চয় সাঙ্গ হয়ে গেছে। জপমালাই দূর থেকে বলল—'আর এখন গিয়ে কি হবে গোঁসাই, পাত কুড়ুতে ? ভোজ তো শেষ গেছে। মন বসিয়ে সবটুকু না শুনলে, তলিয়ে না দেখলে, ঐ যে মহাজনের কথায় শেষে বললে—"রূপ লইঞা অরূপেরে খোঁজে'—সেটুকু আর হয় না--কি বলগো ললিতা মাসী ?"

একটু যেন বেশি ঘোরে পড়ে গেছে বলেই—রঘু নিজে ঘোরে পড়ে গেছে বলেও তার তাই মনে হল--কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাদব দাসকে রঘু রহস্যের সঙ্গে প্রশ্ন করল—"তা, দাদু কেমন বুঝলে তাই না হয় জিজ্ঞেস করি, তুমি তো শুনলে আগাগোড়া আজ · "

ছেড়ে দিয়ে আবার নিজেই বলল—"দাদুর আমাদের মনটা রূপেয়ার সন্ধানেই মসগুল, ওঁর কাছে রূপ আর অরূপ! কী বলো দাদু···জানেন গোঁসাই --এমন হাঁ করে ওপর দিকে চেয়ে পালা শুনছিলো দাদু—মাঝে মাঝে চোখ গিয়ে পড়ছিল তো আমার—মনে হচ্ছিল, বুঝি আকাশ থেকেই পড়বে ঝরে দাদুর রূপেয়া।"

যখন আর কিছু পায় না, ওকে নিয়েই পড়ে।

যাদব দাস খনখনে গলায় বলল—"হ্যাঁ, রে শালী, যখন পড়বে ঝরে—সেদিন এল বলে, আর দেরি নেই—তখন এই দাদুরই গলায় মালা দেওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করবি।"

"ওমা! আমি তো বসেই আছি মালা নিয়ে আমার তমাল গাছের গলায় দেওয়ার জন্যে, তার সঙ্গে টাকা ঝরে পড়া না পড়ার সম্বন্ধ কি ?"

—এমন গম্ভীরভাবে হঠাৎ বলে উঠল যে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। যাদব দাসও হাসতে হাসতে বলল—"দেখবি শালী, দেখবি।"

হাসির মধ্যে কয়েকবার চোখোচোখি হয়ে গেল রঘুর জপমালার সঙ্গে। রঙ্গরসের সঙ্গে পালাগান নিয়ে বৈষ্ণবী তারল্য মিশে গিয়ে ওকে যেন আরও অপরূপ দেখাচ্ছে আজ। বেশি করে দেখতে ইচ্ছে করছে।

আজ কুঞ্জবালার কাছে তুলবে কথাটা।

তুলতেই যাচ্ছিল।

উঠানের একদিকে একটা ঝাঁকড়া আমলকী গাছের নীচে একটা বেলেপাথরের চাতাল আছে। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেয়েরা বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে। পাশের বাড়ি থেকে গিন্নি আর তার পুত্রবধূ আসে। আড্ডাটুকু মেয়েদেরই। যখন সবাই উঠে যায়, কুঞ্জবালা প্রায় আরও কিছুক্ষণ মালার ঝুলিটা হাতে করে একলা বসে থাকে। ঐ ঠিক সময়।

সেদিন পালাগানটা খুব জমেছিল ব'লে তার আলোচনায় ওদের একটু দেরিই হল। কি বলবে, কোথা থেকে আরম্ভ করবে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে সাজাচ্ছিল রঘু, সবাই চলে গেলে একটু সময় দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে, যাদব দাস ঢুকল—'ভাইপো জেগে নাকি ?"

বেশ চাপা গলাতে।

"হাঁ, কেমন ঘুম হচ্ছে না, মনে করলাম মাসিমার কাছে গিয়ে ঠাণ্ডায় একটু না হয় বসি"—রঘু বলল ; প্রশ্ন করল—"কেন, কিছু বলবেন নাকি ?"

"অনেক কিছু।...তা যাও, কাল বললেও হবে, এমন কিছু বয়ে যায়নি সময়। একটু নিরিবিলিও দরকার।...ঐ জপমালার কথা..."

বুকটা ধড়াস করে উঠল রঘুর। গলাটা যথাসাধ্য শান্ত করে ঘাড়টা একটু বাড়িয়ে বলল—"তা বলুন না। ওরা সবাই শুয়েছে ওদের ঘরে, মাসিমাও ওদিকেই—"

এদের আর মেয়েদের ঘর উঠানের দুই প্রান্তে। উঠোনটাও ছোট নয়।

"তবে এই বিছানায় উঠে এসো।"

নীচেই পাতা পাশাপাশি বিছানা। যাদব দাস উঠে বসেছে। রঘু গিয়ে পাশে বসল। যাদবদাস বলল—"দাঁড়াও, তাহালে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। ঘুম কি আমারই হচ্ছে শোনা ইস্তক ?"

ছিলিম সেজে কয়েকটা টান দিয়ে কলকে নিভিয়ে গুছিয়ে বসল। নীচু গলাতেই বলল—"মেয়েছেলে, ওরা কি আর বোঝে ? খালি ঠাট্টা। বিশেষ করে জপা, অতিরিক্ত বাচাল তো। কিন্তু আর তো টিকিটও নয় যে রগ ঘেঁসে চলে গেল।...বলবে, সে দু লাখ চার লাখের মামলা, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকাই কি ফেলে দেওয়ার জিনিস ?.. বলো, কথা কইছ না যে ?"

সংখ্যাটা শুনেই একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় মাথার চুলগুলো পর্যন্ত যেন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে রঘুর। ঠোঁট জিভে ভিজিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলবার জন্যেই প্রশ্ন করল—"পেয়েছেন ?"

'একরকম পাওয়াই বলতে পার।...বড় জোৎদারের ছেলে। নিজের পরিবারকে খুন করে তার গয়নাগাঁটি নিয়ে ফেরার হয়েছে—ধরে দিতে পারলে পাঁচ হাজার—পুলিসের হুলিয়া—দেশে উদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেছে—পালিয়ে এসেছে এদিকে। যে লোকটা পেছু নিয়েছে সেই আমায় বলল—এই রকম আসামী সব সন্ন্যাসী ফকিরদের দলেই ভিড়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় তো—আর তা এইসব দিকেই। লোকটা ধড়িবাজ—তুমি কাল গোবিন্দজীর মন্দিরে যাওনি—নৈলে দেখতে—ভাঁটার মত চোখ—ফোলা ফোলা গোঁফ—আমায় ওদের সঙ্গে বেরুতে দেখে ইসারায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বললে—এই রকম চেহারা, এই বয়স—কাশীতে প্রায় ধরে ফেলেছিল—মাঝে গুলিয়ে যায়, তারপর বৃন্দাবনে কাল এসে পৌঁছে তল্লাসি লাগিয়েছে—দোলের ভীড় জমতে শুরু হয়েছে, গা ঢাকা দেওয়ার এই সময় কিনা—সন্ধান দিতে পারলে ও পাঁচ হাজারের আদ্দেক আমার।...যাদব দাসকে এতই কাঁচা ছেলে পেয়েছে।—টের পেলে সন্ধান দিয়ে ভাগ বসাতে দেবে! তোমাকেও বলা রইল ভাইপো, যদি ...ওকি খামোকা গলগল করে ঘাম ছুটছে যে!—একটু শুয়ে পড়বে না হয় ? বাতাস করছি আমি।..."

"শুয়েই পড়িগে, পাখাটা আমায় দিন। আজ যেন গরমটা হঠাৎ..."

নিঝুম হয়ে উঠে গিয়ে রঘু পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কতদূর থেকে যেন যাদব দাসের কথা কানে আসছে—"কথাটা কিন্তু ঢাউর করতে যেও না। লোকটা আমাকেই ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—এরা আমল দেয় না —তাতে কি ?—যার চেনবার চোখ আছে সে ঠিক চিনে—ঘুম আসছে ভাইপো ?—হ্যাঁ ঘুমোও একটু চেষ্টা করে..."

পরদিন সকাল থেকেই আর রঘুর দেখা পাওয়া গেল না। বর্ধমানে ওদের সঙ্গে যখন একত্র হয়, শুধু একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল। কাশীতে একটা হাল্কা বিছানা করে নেয়, আগের মতো একটা ট্রাঙ্কও কেনে, তার পর বৃন্দাবনে কিছু জিনিসপত্র করে, শেষের দিকে দু একটা শখের জিনিসও। বর্ধমানের সেই ব্যাগ ছাড়া সব কিছুই রয়েছে পড়ে। পরদিন এল না। তার পরেও নয়। তার পরেও নয়।

॥ তেইশ ॥

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দুটো দিন ঘুরে বেড়িয়েছে রঘু। সমস্ত রাত চোখ বুজতে পারে নি। রাত থাকতেই উঠে স্টেশনমুখো হয়েছিল, গাড়ি না পেয়ে হেঁটেই মথুরার পথ ধরল। সকাল হতে একটা টাঙ্গা পেয়ে সোজা স্টেশনেই গেল চলে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, খোঁজ নিয়ে জানল আগ্রা যাবে। যেন ঠিক যা চায়, বড় শহর, আর, তীর্থস্থান নয়। লম্বা কিউয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটাতে গেছে, গাড়িটা হুইসিল দিয়ে ছেড়ে দিল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা গাড়ি এল উল্টো দিক থেকে। না, এদিকের গাড়ি ধরা চলবে না। কিউয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করে জানল এর পর আগ্রার দিকের গাড়ি ঘণ্টা দুই পরে। লাইন ধরে এগিয়ে টিকিটটা কিনে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ভিড় বেড়ে ওঠার সঙ্গে একটু ভরসা পাচ্ছে যেন, শুধু তীর্থযাত্রীদের ভিড় থেকে সযত্নে আলাদা করে রাখছে নিজেকে। স্টেশনের বাইরে আসতে একটা হোটেলের ফোড়ে ধরল। মন্দ নয়, দু ঘণ্টা সময় আছে, স্নান করে কিছু খেয়ে নিতে পারবে। একটা ছমছমে ভাব লেগেই রয়েছে, তার ওপর মনটা গাড়ির দিকে পড়ে থাকায় ক্রমাগতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। লোকটা আরও জন-চার খদ্দের ধরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ল।

একেবারেই স্টেশনের গায়ে নয়, খানিকটা হেঁটে যেতে হল ওদের। রঘুর মনে হল লোকটা যেন ওর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে, বিশেষ করে ওরই ওপর। ঘুরে ঘুরে যে দেখছে এটা ঠিক, চোখাচোখি হয়ে গেল কবার। অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবল, মত বদলে সরে পড়বে। তাতে কিন্তু আরও বিপদ, যদি সন্দেহই হয় তো সেটা বেড়েই যাবে। নিরুপায়ভাবেই এগিয়ে চলল পাশে-পাশে।

ধুকপুকুনিটা কাটল হোটেলে উঠে। মাঝারি চার্জের হোটেল; একটা ঘরে ওর সীটটা দেখিয়ে লোকটা প্রশ্ন করল—খেউড়ি হবে রঘু? 'নাই' অর্থাৎ নাপিত পাঠিয়ে দেবে?

খুব চমৎকার কথা খেয়ালই হয়নি। চাপা নিশ্বাসটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। মুখে হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বলল,—"এর মধ্যে যদি হয় তো ভালই হয়।"

বুকটা হালকা হয়ে যাওয়ার জন্যেই একটু বাড়িয়েও বলতে পারল—"কেবিনেই যেতে হোত সেখানে গিয়ে।"

একটু কারণ দর্শানও প্রয়োজন বোধ করল ; তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রকাশের ছলে একটু হেসে বলল—"বৃন্দাবনে কটা দিন আর নিজের দিকে চাইবার ফুরসৎ ছিল না তো।'

লোকটা সমর্থন করল, মথুরাকেও টেনে নিয়ে বলল—"দুটো জায়গা তো ধরায় বিষ্ণুলোকই।" অন্তরঙ্গ আলাপে আরও হালকা হ'য়ে আসছে মনটা।

নাপিত এলে একবার মনে হল পাকিস্থান ছাড়বার আগের মতো করে নেয় নিজেকে—হাল ফ্যাসানের চুল, পরিষ্কার করে কামানো মুখ। ভেতরে গলদ রয়েছে বলেই আবার মনে হোল সেটা যেন একেবারে ভোল ফিরিয়ে ফেলার মতো হয়, সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে।

মাঝামাঝি দাঁড় করাল একটা। এলোমেলো হয়ে যথেচ্ছা বেড়ে-ওঠা চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটিয়ে বাবরি করে নিল। দাড়িটা রেখেই দিল, তবে গোঁফ অল্প ছেঁটে ছুঁটে কিছুটা পাতলা করে নিল। হোটেল থেকেই তেল নিয়ে বেশ ভালো ক'রে স্নান করে ব্যাগ থেকে আরশি-চিরুনি বের করে মাথাটা আঁচড়ে নিল। আরশির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রতিচ্ছায়া দেখল ভালো করে। বৃন্দাবনের থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত।

স্বস্তি অনুভব করল, আরও খানিকটা নিশ্চিন্ততা।

কিন্তু টেঁকতে দিল না স্বস্তিটুকু।

আহার ক'রে উঠে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা বিড়ি ধরিয়েছে, সেপাই গোছের একটা লোক একটা মোটা বাঁধানো খাতা সমানে ধরল, প্রশ্ন করতে জানাল—নাম আর ঠিকানা লিখে দিতে হবে। "কেন?"—মুখটা শুকিয়ে গিয়ে আপনিই প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল রঘুর। পরে অবশ্য টের পেল হোটেলের সাধারণ নিয়মেই, কখনও হোটেলে ওঠে নাই বলেই জানা ছিল না। কিন্তু বুকটা যে ধড়াস ক'রে উঠেছিল সে ভাবটা যেন যেতেই চায় না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে, আবার যে একটা নূতন নাম ঠিকানা দিতে হবে সেটা মাথায় আসছে না। একটু দৈবানুকুল্য ;—ওদিক থেকে কে ডাকতে লোকটা চলে গেল ; বলল এখুনি আসছি, লিখে রাখুন।

বিলম্বটা লক্ষ্য করল না তো?

মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এল লোকটা। নাম ঠিকানা ততক্ষণে লেখা

হয়ে গেছে—এবার 'সহদেব ঘোষাল, সাকিন হরিহরপুর, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। বাঁকুড়া থেকে একেবারে উল্টোদিকে।

"বকশিস হুজুর"—লোকটা হাত পাততে পকেটে হাত পুরে একটা দু টাকার নোট বেরুল। দিয়েই দিল। ঘুষ।

সেদিন সন্ধ্যার পরও মথুরাতেই রয়েছে রঘু। হোটেলে নয়, স্টেশনের কাছে সে হোটেল থেকে অনেক দূরে শহরের অপর প্রান্তে একটা ধর্মশালায়। ব্যাপারটা হোল এইভাবে—সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে খবর পেল আগ্রার ট্রেণটা আসছে না। খুব গোলমাল, কেউ বলছে কোথায় কলিশন হয়েছে, কেউ বলল এই গাড়ির ইঞ্জিনই কোন্ একটা স্টেশনে ঢুকতে ডি-রেল হয়ে একটা খারাপ রকম একসিডেণ্ট হয়েছে। কারুর মুখে শুনল—আসতে ছ-সাত ঘণ্টা দেরি হবে। কেউ বলল, আজ আসবার সম্ভাবনাই নেই। দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দৈবের হাত, ও ট্রেনটা একটুর জন্যে ছেড়ে গেল, এটার এই দশা, তাকে আটকে ফেলে ধরিয়ে দেওয়ার যেন চক্রান্ত চলেছে কোথায়।...বাউণ্ডুলের মতো নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াল। দূরে কাছে। কয়েকবারই স্টেশনে ফিরে ফিরে এসে খোঁজ নিল। শুধু এইটুকুই জানতে পারলে যে, আজ ট্রেন আসার সম্ভাবনাটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

সমস্ত রাত ঘুম নেই। সকালে ভাল আহার হয়নি, তার উপর এই উদ্বেগ, এই অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। কোনও চিন্তাকে স্পষ্ট করে নিতে পারছে না।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল বৃন্দাবনে ফিরে গেলে কেমন হয়? কথাটা মনে হতেই মনটা যেন জুড়িয়ে গেল খানিকটা—সেই শান্ত, নিশ্চিন্ত পরিবেশ, সবার স্নেহ-প্রীতি দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে রয়েছে জপমালা।...তাই করুক, ফিরে গিয়ে একটু সুস্থির হয়ে নিক। একেবারে এরকম হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়াটাই ভুল হয়েছে। এরপর একদিন গাড়ির খবর বেশ ভালো করে জেনে নিয়ে বেরিয়ে এলেই হবে। যদি হয়ই দরকার। আধা-পাগলা যাদব দাস, সে এতদিন একত্রে থেকেও আন্দাজই করেনি, তার কথায় এরকম তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়াই ভুল হয়েছে।

ফিরেই যাক। পথে যেতে যেতে সমস্তদিন বাইরে কাটাবার একটা ছুতো ঠিক করে নেবে।

একটা টাঙ্গা দেখে ডাকল ; বৃন্দাবন যাবে ? যাবে টাঙ্গাওয়ালা। পথে দুজন যাত্রী তুলে নেবে ; ঠিক হয়ে আছে। সকালে নিয়ে এসেছিল তাদের।

উঠে বসল রঘু। আগ্রার টিকিটের কথা মনে পড়ল। অনেকগুলো টাকা। নাকটা কুঁচকাল, যাক গে। বৃন্দাবন মনটা টানছে।

টাঙ্গাওয়ালা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে একটা বেশ বড় দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। একটা ধর্মশালা। ভেতরে চলে গিয়ে নীচেরই একটা ঘর থেকে দুজন তীর্থযাত্রীর মতো বোঁচকা-বুঁচকি-নেওয়া সওয়ারি নিয়ে এল। একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক, স্বামী-স্ত্রীই মনে হয়। মতটা একটু বদলেছে রঘুর। রাতটা এখানেই কাটিয়ে গেলে কেমন হয় ? বড়ই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। একটু ভালো করে ভাববার সময়ও পায়।

'কি রকম ব্যবস্থা শেঠজী ?'—প্রশ্ন করল রঘু।

বেশ ভালো। জানাল যাত্রীটি। প্রশ্ন করল থাকতে চায় ? তাহলে দুটো টাকা দিলে বিছানাও পাবে। কাছেই একটা হোটেলও আছে।

তীর্থযাত্রী মনে করে লোকটা একটু বাড়িয়েই খবর দিল।

'তাহলে আজ আর গেলাম না"—টাঙ্গাওয়ালাকে কথাটা বলে নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে ব্যাগটা হাতে করে ভেতরে চলে গেল রঘু।

ওর দ্বিধার ভাবটুকু কাটিয়ে দিল বিছানার কথাটা। শুনে অবসাদটা আরও ঘিরে ধরেছে ওকে।

॥ চব্বিশ ॥

বেশ ভালো ব্যবস্থা ধর্মশালার। খোঁজ নিয়ে জানল—একলা থাকার মতো ঘরও আছে, তবে তাতে একটা আলাদা চার্জ দিতে হয়, যদিও নামমাত্রই। বিছানা যাবে পাওয়া, তবে তার জন্য আলাদা দু টাকা দিতে হবে। আর এক টাকা, যদি সিলিং ফ্যান ব্যবহার করে ; বাতির চার্জ নেই। পাশেই হোটেল আছে। গিয়ে খেয়ে এলে শুধু খাবারেরই চার্জ—যার যেমন ফরমাস। ব'লে এলে খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রাহক পিছু আটআনা করে আলাদা চার্জ করে ওরা।

বেশ যাত্রী সমাগম। ওঠা-নামা, আসা-যাওয়া ; তীর্থযাত্রীই বেশি, নানা জাতের। একটা মিশ্র কলরব। ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বেশ যেন

হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। ম্যানেজারই একজন লোক সঙ্গে দিয়েছে, ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা একানে ঘর খুলে দিয়ে আলোটা জেলে দিল, বলল, বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছে। প্রশ্ন করল—ফ্যান খুলে দেবে ?

রঘু বলতে খুলে দিয়ে বলল, স্নান করে তো বারান্দায় দুদিকে মেয়ে-পুরুষদের আলাদা দুটো দুটো করে চার চারটে স্নানাগার আছে।

যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে রঘুর। হঠাৎ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এত পরিবর্তন। যেন ছেলেবেলার বইয়ে পড়া 'আলাদীনের প্রদীপ'। দিনটা যেন দুঃস্বপ্নের মতোই আলাদা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতিটাকে সাহায্য করল একটা জিনিস, টাকার বিশেষ অনটন নেই। খিদিরপুরে ভালোই চাকরি করত, জমতই টাকা, আর এই কটা মাসে খরচ খুব অল্পই হয়েছে, কুঞ্জবালা খাওয়ার খরচটা একেবারেই নিত না। সেই কথাই ধরে ছিল, মাসি বলেছ, বোনপোর মতনই থাকবে।

চৌকিতে বসে ফ্যানের হাওয়ায় একটু জুড়িয়ে নিল শরীরটা। বিছানাটা পেতে নিয়ে, ভালো করে গা-হাত-পা ধুয়ে এসে আরও আরাম বোধ হচ্ছে। আহার সেরে ভালো করে একটি নিদ্রা। ঘরে ওদেরই দেওয়া তালা লাগিয়ে নেমে গেল রঘু। রাত বেশি হয়নি, যদি পেয়ে যায় তৈরী খাবার তো হোটেলেই খেয়ে আসবে, নয়তো ঘরে দিয়ে যেতে বলে আসবে।

পাওয়া গেল তৈরী। ভালো রকমই। পরোটা মাংস রাবড়ি। আহার সেরে হোটেলের বাইরে পান খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধর্মশালার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, সামনে গোটা দশ ধাপ ওপরে দৃষ্টি পড়তে সমস্ত শরীরটা হিম হয়ে পড়ল রঘুর; পড়েই যেত, পাশে রেলিংটা চেপে সম্মোহিতের মতো ওপরের দিকে চেয়ে রইলো।

যাদব দাস।

একবার মনে হ'ল ব্যাগটুকুরও মায়া কাটিয়ে নেমে যায়; ধর্মশালা ছেড়ে চলেই যায়। তারপর বিপদের যে একটা প্রবল আকর্ষণ আছে তারই বশে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িতে ওঠানামার চঞ্চল ভিড়ই, তার মধ্যে যাদব দাসের ঘাড়ে-টিকি ন্যাড়া মাথাটা আর সবার মাথার ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভিড়ের সঙ্গেই উঠছে যাদবদাস। আস্তে আস্তে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে ভিড়ের ওপর। একবার পেছনের দিকে মাথাটা একটু ঘুরতে একটু হাঁটু মুড়ে নিজেকে লুকিয়ে নিল রঘু। যাদবদাস সিঁড়ি ছেড়ে বারান্দায় উঠল, একবার

ছদিক চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বাঁদিকে পা বাড়াল রঘুর কামরাটার দিকে। রঘু গোটাচারেক ধাপ উঠে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকটা ওঠানামা করছে। শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়াল। যাদবদাস অনেকটা এগিয়ে গেছে, একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যেন ভেতরের দিকে লক্ষ্য করছে। একটু ঝিমুনো ভাব, গাঁজার ঝোঁকে ওর যেমন একটু লেগেই থাকে।

রঘু বারান্দায় উঠল ; খুব সন্তর্পণে, তারপর ওদিকে আর না মুখ ফিরিয়ে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে কপাটের ছিটকিনি তুলে দিল, বাতি জেলে ফ্যান খুলে বিছানায় ব'সে পড়ল। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় যেন আছাড় খাচ্ছে।

যাদব দাস সেই পাঁচ হাজার টাকার পেছনে। এটা লটারির চেয়ে এত হাতের কাছে, এত সম্ভাবনার মধ্যে যে, সে উঠেপড়ে লেগেছে। এর জন্যেই তাহলে আজকাল বাসা ছেড়ে এত বাইরে বাইরে থাকে! পাশাপাশি দুটো শহরের হোটেল-ধর্মশালা-মন্দির-ঘাট এক করে বেড়াচ্ছে।

ঘুম ক্লান্তি ছুটে গেছে রঘুর। ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকাটা বোধহয় ভুলই হল। ব্যাগটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে বেরিয়ে যাওয়াটাই উচিত ছিল। এমনও তো হতে পারে, বৃন্দাবন থেকে রঘু এইভাবে হঠাৎ সরে পড়েছে বলেই যাদব দাসের সন্দেহটা জমে বসেছে ওর ওপর, তার জন্যেই ও শহর ঘেঁটে শেষপর্যন্ত এখানে এসে উঠেছে। আজ ওরও ফিরতে বেশ রাতই হয়ে যাবে ; এতটা হচ্ছিল না।

চিন্তার নূতন নূতন ফিকড়ি বেরুচ্ছে উত্ত মস্তিষ্কে। এমনও কি হতে পারে না যে লোভ বেড়ে গিয়ে, ওর ঘর রাত না হতে এরকম বন্ধ দেখে সন্দেহের বশে ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে এসে দোর খোলাবার চেষ্টা করবে যাদব দাস।

আর পারছে না রঘু। অবসাদে শরীর এলিয়ে তন্দ্রাও আসছে একএকবার, তারপর আশঙ্কার দমকে ছাঁৎ ছাঁৎ করে ভেঙে যাচ্ছে। শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল বিছানায়, নিজেকে যেন টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরে গেছে। মরিয়া মানুষের আত্মঘাতী সংকল্প। ধরিয়ে দেবে নিজেকে যাদব দাসের হাতে, এভাবে কাটাতে আর পারে না। যা আসছেই তাকে দুপা এগিয়ে নিয়ে আসা বৈ তো নয়।

ছিটকিনি খোলবার জন্যেই উঠেছে, কপাটে ধাক্কা পড়ল। আবার একচোট দ্বিধা কাটিয়ে রঘু প্রশ্ন করল—"কে ?"

"হুজুরের খানার কথা বলে আসব ?"

"না, আমি খেয়ে এসেছি।"

"আর যদি কিছু দরকার থাকে।"

যারা চার্জ দিয়ে একা ঘরে থাকে তাদের একটু খাতির বেশিই এদের কাছে।

রঘু উত্তর করল—"না…আমি ঘুমুতে যাচ্ছি, কেউ তুলতে এলে বারণ করবে। আর শোনো "

"জী হুজুর…"

"বলবে এ্যামেরিকান সায়েব আছে একজন। ঐ হিপি। পারবে? তাহলে কেউ ঘাঁটাবে না।"

"কেউ দিক না করবে, আপনি বেফিকির শোওয়া করুন।"

আধ মিনিট। লোকটার চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে মুখটা বের করে ডাকল রঘু—"এই ভাইয়া, শোন।"

"জী হুজুর।" এগিয়ে এল লোকটা।

"একটা লোক এখুনি দেখলাম। খুব কালো, লম্বা, মাথা-কামানো, এইখানে লম্বা টিকি…"—হাত ঘুরিয়ে ঘাড়টা দেখাল।

"জী, হাঁ, আসছেভি। বোলায় দোবো?"

"রোজ আসে ?"

"না, তিসরা রোজ আসছিল, ফিন আজ আসছে।"

"আছে এখনও ?…কেন আসে ?"

"একটা দোস্ত্‌কে তল্লাস করে। বোলায়ে দোবো ?"

"না, না। লোকটা…" কি করে নিজের দোষটাই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে বলতে যাচ্ছিল—'লোকটা খুনী, আসতে দিওনা।' সামলে নিয়ে বলল—"তুমি এখন যাও। পরে ডাকব। দেখবে, আমায় যেন কেউ না তোলে।"

আবার দ্বিধা। ধরিয়ে দেবে নিজেকে, তবে এখন একটু ঘুমিয়ে নিক। যখন আসছেই, কালও আবার আসতে পারে।

॥ পঁচিশ ॥

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সমস্ত দিনের ঘটনাগুলো এলোমেলো স্বপ্নে ঘুমটা ভেঙে গেল। বারান্দার দিকের জানালা দিয়ে একটু ধূসর আলো নজরে পড়তে মনে হল ভোর হয়েছে ; উঠে বসল রঘু। মাথাটা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে জেগে উঠায় বেশ একটা স্বস্তির ভাব আবার এসে পড়েছে। না, নিজেকে ধরিয়ে দিতে যাবে কেন? অনেক জায়গা আছে পৃথিবীতে।

তবে থাকা আর এখানে চলবে না।

আগ্রাতেই যাবে। একসিডেন্টের জন্যে গাড়ি বন্ধ ছিল। ঐ টিকিটেই যাওয়া যাবে নিশ্চয়। গোলমাল থাকে, নূতন টিকিট করবে। টাকা আছে। তাতে ওদিক দিয়ে একটা স্বচ্ছন্দতার ভাব জাগিয়ে রেখেছে।

কালকের সেই সাড়ে সাতটার ট্রেনটা ধরতে হবে। অনেকটা দূর তারপর কিউ আছে। এদিকে ধর্মশালার বিশেষ চার্জগুলাও রয়েছে। তাহলে তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিকে আসুক।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, ভোরের আলো নয়; সিঁড়ির সামনে হলের মাঝামাঝি যে সাদা টিউব লাইটটা জলে তার আলোটা ক্ষীণ হয়ে এসে ভেতর থেকে ঐ রকম ভোরের আলোর মত দেখচ্ছিল। সিঁড়ির সামনে যে দেওয়াল-ঘড়িটা রয়েছে তাতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। ফাল্গুনের এ সময় রাতই বলা যায়, শেষ রাত।

আর একটু শুয়ে থাকবে তাহলে? তাই করুক, তবে হাত-মুখ ধুয়ে আসুক, ঘুমের জড়তাটুকু কেটে যাবে।

আলোটা স্নানাগারের দিকে অল্পে অল্পে আরও মলিন হয়ে এসে রাত্রির ভাবটাই স্পষ্ট করে এনেছে এদিকে, বারান্দার বাইরে দিয়ে আকাশে নক্ষত্র দেখা যায়।

স্নানাগারে বাতির সুইচ আছেই নিশ্চয়।

এগিয়ে গেছে, মেয়েদের জোড়া স্নানাগারের একটা দোর সুইচ টেপার খুট ক'রে আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ খুলে গেল। সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতার

জন্য রঘু একটু চমকে গিয়েছিল, পরক্ষণেই কাঠের পুতুলের মতোই অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। ভূত দেখেছে। ধপধপে শাড়ি পরা, এলো চুল।

ওদিকেও সেই অবস্থা, তবে দৃষ্টিতে ভয়ের জায়গায় বিস্ময়, দ্বিধা , ভ্রু-দুটো কুঁচকে নেমে এসেছে।

রঘুর মুখেই প্রথম কথা বেরুল—

"থাকো না ?"

ওদিক থেকে কোনও উত্তর নেই।

"থাকোই তো। আমি রঘু। চিনতে পারছ না ?"

"জসীমপুরের…"

"হাঁ, জসীমপুরের। হলধর সামন্তের ছেলে রঘুনাথ।"

দাড়ি গোঁফ চুলের উপর নজর আটকে যাচ্ছে দেখে বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না ?—রাখতে হয়েছে এসব—অনেক কথা আছে…"

গলার আওয়াজ কেঁপে যাচ্ছে ভেতরের উত্তেজনায়। তবুও ওর মনটা যেন সন্দেহ আর বিশ্বাসের মাঝে দোল খাচ্ছে দেখে—নিশ্চয় স্ত্রীলোক বলেই—বলল—"এ্যাঁ, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না ?—তাহলে…"

অসহ্য অসহায় ভাবে একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"হয়েছে। একটু দাঁড়িয়ে থাকো—থাকবে ?—দু' মিনিট—যাব আর আসব…"

"এখানে—এভাবে—এসময়…"

স্ত্রীলোক বলেই কথাগুলো ঠেলে বেরুল ওর মুখ দিয়ে। রঘু এগিয়েই ছিল, হন্তদন্ত হয়ে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে—"আমিই তো—দোষ নেই—বলে চলে গেল।

একটু পরেই সেইভাবে ফিরে এসে একটা ডায়মণ্ড কাটা সোনার বালা সামনে ধরে প্রশ্ন করল—"চেন এটা ?"

দেখে নিয়ে চোখদুটো মুখের ওপর তুলে ধরল স্ত্রীলোকটি। বিস্ময়ে আবার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

রঘু বলল—"তুমিই দিয়েছিলে—একজোড়া।—যখন লুকিয়ে দিতে—আমি ক্ষীরোদাকে দিই—সে আমায় পাকিস্থান ছাড়বার সময় দিয়ে দেয়—একখানা বেচতে হয়েছিল—সে সব অনেক কথা—এখানে তো হবে না—ধর্মশালাতে থেকেও না…"

"কী করতে বল ?"—পরিচয়টা মেনে নিল থাকোমণি এতক্ষণে।

এতক্ষণে ছু'চোখ চেপে জল গড়িয়ে পড়ল।

"কাঁদবারও সময় নয় এটা—ইয়ে, আমি আগ্রা যাচ্ছিলাম।—বেরুচ্ছিলামই এখুনি—পারবে যেতে সঙ্গে ?...হ্যাঁ, এখুনি—যেখানে রয়েছ সেখানে আর ফিরে না গিয়ে—ফিরে গেলে শক্ত হবে—"

"কি করে ?..."

—সেই নারীমনের দ্বিধা। রঘুর মনেও একটা চিন্তার ফল্গু বয়ে চলেছে নিজের পথ ধরে। থাকোমণির কথাটা যেন কানে যায়নি, এইভাবে বলল—"চলো—গেটকিপারটাই এক সন্দেহ করতে পারে—কিছু হাতে গুঁজে দিলেই হবে—কত হচ্ছে এরকম এসব জায়গায়···আমরা তো দুজনেই রয়েছি—স্বামী স্ত্রীই···'

॥ ছাব্বিশ ॥

গেটকীপার কোনও সন্দেহই করল না। তীর্থস্থানের ধর্মশালা ; আসা-যাওয়া সব সময়েই প্রায় লেগে থাকে, অত চিনেও তো রাখে না বা সম্ভব হয় না রাখতে। মনটা খুব চঞ্চল হয়ে থাকলেও মাথাটা পরিষ্কার রয়েছে রঘুর। একটা প্রশ্ন যে উঠতে পারে গেটে তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। গেটকীপার উঠে দাঁড়াতে নিজে হতেই বলল—"বিছানা আর ফ্যান ছিল আমাদের। আপিস খোলেনি এখনও। এই একটা পাঁচ টাকার নোট। ধরো। চার্জ দিয়ে যা বাকী থাকে সেটা তোমার বকশিস। আমাদের ভোরের গাড়ি ধরতে হবে।"

নোটটা বাড়িয়ে ধরল। গেটকীপার সেটা হাতে মুড়ে নিয়ে একটা সেলাম করে গেট খুলে দিল। বেরিয়ে এসে পাশাপাশি চলল ওরা।

বড় রাস্তায় উঠে থাকোমণি বলল—"তুমি কিন্তু দশটাকার নোট দিলে মনে হ'ল।"

"হ্যাঁ, তাই, ও আর পেছু ডাকবেনা। চলো পা চালিয়ে দাও।"

একটু এগিয়ে গিয়ে লঘু-কৌতুকে প্রশ্ন করল—"এবার পারলে চিনতে ?"

অল্প একটু হাসি ফুটল থাকোমণির অধরে।

"একটা টাঙা পাওয়া দরকার, বা রিকশা—মাথা ঘুরিয়ে দেখল রঘু, বলল

—"একটা কথা বলে রাখি। যাই পাই কোনও কথা কয়ো না, তীর্থের এরা বাংলা বোঝে কিছু কিছু। পা চালিয়ে দাও একটু।

আরো খানিকটা গিয়ে ওরা পেল একটা রিকসা।

স্টেশনে এসব কথা কইবার কোন সুযোগই ছিল না; ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে আরও নয়। দশটার সময় আগ্রায় পৌঁছে ওরা একটা সস্তা হোটেলে উঠে দুজনের মতো ঘর ভাড়া করল একটা। বাজারের ওপরই। নেমে শাড়ি-সায়া থেকে থাকোমণির কয়েকটা সদ্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে এল। একটা মাঝারি গোছের ট্রাঙ্কও।

কথা একটু-আধটু যা হচ্ছে তা এইসবই নিয়ে। "অসীমপুর".. বলে থাকোমণি একবার কি বলতে যাচ্ছিল, রঘু নীচু গলায় টুকে দিল—'থাক, দেওয়ালেরও কান আছে।" ওদিকের কোনও কথা আর হোল না। দুটো চৌকি ছিল, বিছানা ভাড়া করে নিয়ে পেতে নিল। গোছ-গাছ করা হয়ে গেলে বলল—"একটু বসে থাকো তুমি, নীচেই কেবিন, আমি মুখোসটা নামিয়ে আসি।"

মাথা-মুখে হাত বুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল একেবারে আগেকার চেহারা নিয়ে; মুখ পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুলও ভালো করে ছাঁটা আগেকার মতো। থাকোমণি একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল; রঘু এগিয়ে এসে অল্প হেসে বলল—"এবার গেল ধোঁকা?"

থাকোমণিও একটু ম্লান হেসে উত্তর করল—"ধোঁকা দেখামাত্রই গিয়েছিল; আর যাকেই হোক, মুখোসে নিজের পরিবারকে ঠকানো যায় না। এসো ভেতরে। বড্ড দেরি করলে।"

এতেও মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল রঘু কি ভেবে, বলল—"না, কেবিনে দুটো চেয়ারের কোনটাই খালি ছিল না। দূরে আর খুঁজতে গেলাম না। ...নাও তুমি আগে চান-টান সেরে এসো।"

স্নান করে আহার করতে দুটো হয়ে গেল ওদের। রঘু দোর বন্ধ করতে করতে বলল—"এবার তুমি একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে, কাল শেষ রাত্তিরের দিকেই কোনও ট্রেন থেকে নেমে এসেছিলে হোটেলে।

"হ্যাঁ আমরা..."

—থাকোমণি নিজের চৌকিতে বসতে বসতে আরম্ভ করেছে, রঘু আঙুল তুলে বলল—"থাক্ এখন।"

ওরই মধ্যে একটু হাল্কা ঘুম এসে গিয়েছিল, দরজায় ঠকঠক করে আওয়াজ হতে থাকোমণি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে গায়ে একটু নাড়া দিয়ে চাপা গলায় ডাকল—ওগো ওঠ কে ডাকছে।"

"কে ?"—বলে একটু ত্রস্তভাবেই উঠে বসতে বাইরে থেকে প্রশ্ন করল—'চা-টোস্ট হাজির করু জনাব ?"

সন্ধ্যা হ'য়ে এলে ওরা ঘরে তালা ঝুলিয়ে কাছেই একটা পার্কে গিয়ে বসল, ভুজনের যোগ্য একটা বেঞ্চও পেল। চুপচাপই একটু বসে রইল ওরা। ছোট ছেলে-মেয়েরা হুটোপুটি খেলা করছে, কয়েকজন 'আয়া' গোছের স্ত্রীলোক কচি শিশুসুদ্ধ পেরামবুলেটার দাঁড় করিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, দেখতে লাগল ভুজনে। সন্ধ্যা একটু গাঢ় হয়ে এলে, একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে, ওরা তু-একজন করে চলে গেল। শুধু স্বাস্থ্যান্বেষী কয়েকজন প্রৌঢ় পার্কের চারিদিকে চক্কোর দিচ্ছে। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঘুরিয়ে দেখেও নিচ্ছে এদের ; অন্য সব বেঞ্চগুলা একে একে খালি হয়ে আসছে।

রাত থেকে কোনও কথা নেই, থাকোমণি ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে অতিরিক্ত, আবার কি একটা প্রশ্ন করবার জন্যে—"আচ্ছা, সেই যে…" বলে মুখ খুলেছে, এবারেও রঘু গায়ে একটা আঙুল টিপে বলল—"আর একটু যাক্।"

আরও কিছুক্ষণ করে স্বাস্থ্যপরিক্রমা শেষ করে ওরাও চলে গেলে রঘু বলল—"সকাল থেকেই বাধা দিচ্ছি, না ? জানোনা বোধহয় আমার মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া রয়েছে থাকো, কীভাবে কত সাবধানে যে ·"

"জানি গো জানি"—বলে আর কথার বোঝা যেন বইতে না পেরেই থাকোমণি হু হু করে কেঁদে উঠে স্বামীর কোলে লুটিয়ে পড়ল, কান্নার মাঝখানে ভেঙে ভেঙে বলে যেতে লাগল—"তাই না আমি তীর্থে তীর্থে ঠাকুরদের পায়ে মাথা খুঁড়ে বেড়াচ্ছি—আগে বুঝিনি, নিজের কপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম—সেও যে কেন, কত যন্ত্রণায়, আতঙ্কে, যদি শোন…"

কাঁধটা একবার চেপে ধরে রঘু বলল—"ওঠ লক্ষ্মীটি।"

অল্প টান দিয়ে তুলেই পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—"চুপ কারো। এবার ও বিপদটা তো কেটে গেছে।"···

কান্নার মধ্যেই আশা আর বিস্ময়ে মুখের ওপর চোখ তুলে থাকোমণি প্রশ্ন করল—"কি করে?"

"যাকে খুন ক'রে ফেরার হয়েছি সে-তো এই পাশেই রয়েছে।"—বুকের কাছে চেপে ধরে একটু হাসল। সোজা কথাটা হয়তো মনের জটিল অবস্থার জন্যেই ঠিক ধরতে না পারায় থাকোকে একটু মূঢ়ভাবেই চেয়ে থাকতে দেখে বলল—"তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে থানায় বা আদালতে বলা, খুন আমি কৈ করেছি যে হুলিয়া আমার নামে? এই তো আমার স্ত্রী; এর চেয়ে তো বড় প্রমাণ হতে পারে না।···হচ্ছে না পরিষ্কার তোমার কাছে?"

শুনতে শুনতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে আসছিল থাকোমণির, চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলল—'তাইতেই হবে? তুলে নেবে হুলিয়া ওরা?"

—এতবড় জীবনমৃত্যুর সমস্যার এত সহজ সমাধান বলেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হবে কিনা ভেবে ছাখোনা। মূলেই আর কিছু রইল না, ফাঁসিতে লটকে দেবে? —এবার তুমি হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে গেলে কেন, সেই কথাই বলো আগে। কথা তো দুদিকেই অনেক, সব শুনতে সময় লাগবে। আগে তোমার বাড়িছাড়ার কাহিনীটাই শুনি···"

একটু থেমে গিয়ে বলল—'বোস, চলো বরং হোটেলেই চলে যাই। তোমায় পাওয়া গেছে, আর অত ভয়ে ভয়ে থাকবার দরকারই বা কি?·· জানো, আমিও কেন এত অতিরিক্ত সাবধান হয়ে উঠেছি হঠাৎ? থাক, সে সব শুনবেই।··· না, সে লোকটা হঠাৎ বাসা ছেড়ে এতদূর ধাওয়া করতে যাবে না, আধ-পাগলা মানুষ একটা। নাও ওঠো। ঠাণ্ডাটা লাগানো ঠিক হবে না।'

॥ সাতাশ ॥

হোটেলে এদের ঘরটা দোতলায় একেবারে শেষ দিকে ছিল, পাশে মাত্র আর একটি ঘর। আরও একটু সুবিধা হল, ওরা উঠে দোর খুলেছে, পাশের ঘরের খদ্দেররা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর ঘরে লোক রয়েছে জনচারেক বোধহয়, গল্প করছে, এরা নিজেদের ঘরের চেয়ার দুটো

বের করে নিয়ে খালি ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিং এর ধারে বসে আরও খানিকটা দূরে ক'রে নিল নিজেদের। রঘু বলল—'বল এবার।'

'কোথায় যে আরম্ভ করি'—ব'লে এক-বার আকাশের দিকে চেয়ে নিল থাকো; তারপর শুরু করল—'সেই ঝড়ের রাত্তিরের কথা। তোমায় যে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিতাম এটা পিসীর ভালো লাগত না, জানই তো তুমি। ওর শাসানি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। দু'জনের মাঝখানে পড়ে আমার কি অবস্থা যাচ্ছিল তাও তোমার অজানা নয়। বাবা দলিল আমার নামে লিখে দেওয়ার পর ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। তুমি একদিন এসে পিসির সঙ্গে ঝগড়া করে গুণ্ডা নিয়ে আসবে বলে ভয় দেখিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেলে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বললাম্—দলিল নিয়েই যদি এত হাঙ্গামা, আমি, পালটে দিচ্ছি দলিল—যাঁর সম্পত্তি তিনিই রাখুন। পিসি একেবারে ফেটে পড়ল আমার ওপর। তারপর থেকেই উঠতে বসতে গঞ্জনা—রাণী করে দিয়েছি, তাই দরাজ বুক। সম্পত্তি গেলে রাণী দাঁড়াবেন কোথায়, রাণীর কি হাল হবে ভেবে দেখেছেন কি? উত্তর না পেয়ে আবার যেই বলেছেন—'চুপ করলে যে?' আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল—'লোকটা বোধহয় তত খারাপ নয় পিসি।'

এইটুকুই, বেশ মনে আছে। তারপর থেকেই কথা বন্ধ একেবারে। কথা বন্ধ তো বন্ধই থাক, তাতো নয়—সোজা না ব'লে ঠেস দিয়ে ক্রমাগত চিপটেন কাটা—জিভের ধার তো জানই সে যেন আরও কেটে কেটে নুনের ছিটে দেওয়া মুঠো মুঠো। বেড়েই চলেছে, সবই ওই দেয়ালকে শুনিয়ে, আমার সঙ্গে কথা একেবারেই বন্ধ। তারপর আবার সোজা আমাকেই। আমি অবশ্য যেমন বলবার আগেকার মতনই সোজা ওকেই বলে যাচ্ছি সব কথা।

বেরস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজো ছিল সেদিন। সন্ধ্যের সময় ভৈরবকাকা আসতে আমি যেই শেতলের মিষ্টি আনিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি, ঝণাৎ করে চাবিটা ফেলে দিয়ে ভৈরব কাকাকেই বললে, ওর সঙ্গে সংসারের আর কোনও সম্বন্ধ নেই। তারপর আরও চিপটেন, আরও চাপা গঞ্জনা, এবার আর বিরাম নেই।

এর পরেই ঐ ব্যাপারটা হোল। একদিন যেমন বললাম এখুনি, সোজাসুজি আমাকেই।

একটু চুপ করল থাকোমণি। চোখ দুটো আকাশ থেকে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে এসে মুখের ভাবটা পরিবর্তন হয়ে আসছে, কি একটা দারুণ

আতঙ্কে ; চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটা গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে, দৃষ্টি নামিয়ে দিয়ে দেখছে কত গভীর গহ্বরটা, আর এক পা-ও এগুনো চলবে কিনা।

রঘু বলল—'থেমে গেলে যে ?"

একটু চকিত হয়ে উঠেই ওর মুখের ওপর চোখ তুলে চাইল থাকো। চেয়েই রইল একটু অবোধ দৃষ্টিতে। তারপরেই মুখের ভাবটা বদলে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, বলল—'এঁ্যা বলতে হবে ? ··বেশ, বলব। হ্যাঁ, বলবই আমি।···তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

তোমরা যেমন জান আমি এদিকের মেয়ে, মালীপুরের তোমাদের এক স্বজাতেরই ঘরের মেয়ে, আসলে আমি তা নয়।'—বলে শুরু করে ওর পাকিস্থানে বাড়ির কথা। সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্থানী সেপাইদের ভয়ে ওকে নিয়ে পালিয়ে আসা প্রসাদীর নিজের আত্মীয়া বলে জাত ভাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়া রঘুর সঙ্গে। থাকোমণি সদগোপ না, ওদিকের এক কায়েতের ঘরের মেয়ে—যেসব কথা শুধু হলধরকে বলে দিব্যি দিয়ে বারণ করে দিয়েছিল প্রকাশ করতে প্রসাদী—সব বলে গেল থাকোমণি। শুনে যাচ্ছে রঘু। একটা বিস্ময়ের ভাব অবশ্য লেগে রয়েছে মুখে, এক এক সময় তীক্ষ্ণও হয়ে উঠছে সে ভাব, তবে অভিভূত হয়ে পড়ার মতো নয়। খুব বেশি কৌতূহলও নয় ; অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে, এ কাহিনীটা তার নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িত বলেই যতটুকু কৌতূহলী হওয়ার কথা।

এতদূর পর্যন্ত বলে আবার চুপ করে গিয়ে মুখটা নীচু করে নিল থাকোমণি, টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে চোখ থেকে। চুপ করে আছে রঘুও। এক সময় আবার মুখ সোজা করে তার চোখের ওপর চোখ তুলে ধরল থাকোমণি। তারপর আবার সেই কঠিন মুখের ভাব।

শুরু করল—'তারপর, যা বলতে যাচ্ছিলাম। সেদিনও বেরস্পতিবার। সকাল থেকেই আকাশে দুর্যোগ। পিসি একটু বেরুলেই রেহাই পাই। সেদিন সেটুকুও বন্ধ। লক্ষ্মীর শেতলের ব্যবস্থা আমিই করতাম। কোষাকুষি আর তামার টাট নিয়ে তারই জোগাড় করতে যাচ্ছিলাম, বাক্যিবান ঝাড়তে ছাড়তে পিসি ওদিক থেকে আসছে, আর সহ্যি করতে না পেরে—ও পিসিমা আর কতো ?'—বলে পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছি—'তোর কোমরের গোট থাকো ?, বলে পিসি চিৎকার করে উঠল।

রূপোর গোটের কথা তুমি জানই। আছড়ে পড়তে পিঠের ব্লাউজটা যে একটু উঠে গেছে তাইতে নজর পড়ে গেছে ওর। বলতে হোল, গোটের কথাটা। রাগে কাঁপছে। শুনে বলল—"তোর গয়নার বাক্স নিয়ে আয়, দেখব।' বললাম—'কি আর দেখবে? কিছু গেছে তো বলেইছি' কিন্তু শুনল না। তারপর নিয়ে আসতে যাচ্ছি, আবার ঘুরিয়ে নিলে—'যেতে হবে না, এগিয়ে আয়'—তার পরেই—তারপরেই সেই ভয়ঙ্কর কথা—'জানিস, এতো সোহাগ—একটি কথাতেই সে সোহাগ ভেঙে দিতে পারি—জানিস। জানিস!'

বলতে বলতে হঠাৎ একটু সরে গিয়ে রেলিংটা বুকে চেপে হু হু করে আবার কেঁদে উঠল থাকো। "কি হোল?"—বলে রঘু এগিয়ে যেতে আরও বেশি করে তফাৎ হয়ে গিয়ে চাপা কান্নার মধ্যে বলে উঠল—"সরো, সরো, ও বলবে কি, আমিই একদিন বলব ঠিক করেছিলাম তোমায়, শুধু ঠিকমতো পাচ্ছিলাম না তোমায়—পাপের বোঝা আর পারছিলাম না বইতে—সরো, আমায় ছুঁয়ো না—আমায়—আমায় একটা রাত কাটাতে হয় তাদের তাঁবুতে—পারেনি সরিয়ে ফেলতে পিসি—একটা রাত—উঃ। উঃ—তীর্থে আমার করবে কি? আমি উলটে তীর্থ নোংড়া করে বেড়াচ্ছি—উঃ! মাগো!…"

যেন বজ্রাহত হয়ে নিঃসাড় হয়ে গেছে রঘু। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে যাচ্ছে থাকো। কী যে বলবে, রঘু বুঝে উঠতে পারছে না, নিজের মনের ভাবটাই যে কী ধরতে পারছে না। কত বিপদ এল, কত উৎকট সঙ্কট, কিন্তু এত অসহায় বোধ কখনও করেনি। অনেকক্ষণ গেল। ভাষা ফুরিয়ে গিয়ে শুধু একটা ক্লান্ত, ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে থাকোর রেলিঙে চাপা মুখের মধ্যে থেকে। ও সরে আস্তে আস্তে গিয়ে কাঁধে হাত দিল। চুপ করেই রইল কিছুক্ষণ একভাবে। তারপর মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—"চুপ করো মণি। যে অসহায়, পারল না কোনও মতে নিজেকে রক্ষা করতে, পুরুষ হয়েও প্রাণভয়ে যাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে গেল না, তাকে ছুঁলে পাপ হবে—এত নিষ্পাপ মানুষ এ পৃথিবীতে আছে কিনা জানি না—আমার তো নজরে পড়েনি আজ পর্যন্ত। চুপ করো তুমি। তীর্থ যদি এতে নোংরা হয়, নাইবা গেলাম আর তীর্থে—চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই।"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল, রঘু শুধু এক একবার যেন চাপা আবেগে ওর কাঁধে-রাখা মুঠোটা চেপে চেপে ধরছে। একসময় ওই

মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—"আজ না হয় এই পর্যন্তই থাক। সমস্ত দিন একটু জিরুবার সময় পাওনি···আমিও। খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়বে চলো। কাল সকালে ছেড়েও যাব এ হোটেল—না থাকাই ভালো এই জায়গায়। তুমি যাও ভেতরে। আমি ঘরে খাবার দিয়ে যেতে বলে আসি।"

॥ আঠাশ ॥

সেই রাত্রেই।

হোটেল একেবারে নিষুপ্ত। শহরেও বিশেষ শব্দ নেই। হোটেলের নীচের সড়কে দু-একটা মোটর, কি টাঙার ছুটে যাওয়ার শব্দ ছাড়া। হোটেলেরই কোথাও ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। অপ্রশস্ত এককোনে দুটো চৌকি, আলাদা আলাদাই শুয়ে ছিল দুজনে, রঘু উঠে গিয়ে সোরাই থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে, থাকোমণি উল্টোদিকে মুখ করে শুয়েছিল, ঘাড়টা ফেরাল। "তোমায় দোব জল?"—প্রশ্ন করল রঘু।

"একটু আগে উঠে খেয়েছি।" থাকো উত্তর করল। বলল—"নিজে গড়িয়ে নিলে, আমায় ডাকলেই পারতে।"

একটু ম্লান হাসি নিয়ে চাইল রঘু।

"সে আয়েসের অভ্যেস অনেকদিন ছেড়ে গেছে।" কথাটা বলতে বলতে ওর চৌকির কিনারায় বসল—প্রশ্ন করল—"ঘুম হচ্ছে না, নয়?"

"ওদিকে একটু হয়েছিল যেন, ছমছমে। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।"

"আমার একেবারেই হয়নি, হওয়ার লক্ষণও দেখছি না কোন।···"

একটি কথা—তোমার কথাগুলো শুনতাম। কষ্ট হবে তোমার? তাহলে না হয় থাকই।"

উঠে বসেছে থাকোমণি, বলল—"তোমার তাহলে তো আরও ঘুম আসবে না। সুখের তো নয়।···"

"সব চেয়ে যেটা দুঃখের ছিল সেটা তো···"

মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই থেমে গেল রঘু, ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"না, থাকো শুনেই নিই। ঘুম হচ্ছে না ধুকপুকুনি লেগে থাকার জন্যেও। তাছাড়া এমন নিরিবিলি হঠাৎ পাবও না। নাবো, চলো।"

রেলিঙের ধারে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল দুজনে। থাকোমণি একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল।

"যেদিন এলাম বাড়ি ছেড়ে সেদিন থেকেই তাহলে আরম্ভ করি।...হ্যাঁ, একটা কথা ছেড়ে যাচ্ছে—ঐ রকম উৎকট ভয়টা দেখাবার পরই পিসির ভাবটা কিন্তু একেবারেই বদলে গেল। দুটো দিন যে ছিলাম তারপরেও—এত মিষ্টি কথা, এত আদর এত আত্তিখি বোধহয় জীবনে আগে কখনও পাইনি ওর কাছে। বাড়ির ঝিই একরকম, তবে ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায়—বাবাকেও হারালাম যখন বছর সাতেক বয়েস—কাকা সংসারের কর্তা—কর্তা, অবশ্য নামেই, কাকীমাই সব—তেমনি উগ্রস্বভাব—আমার সঙ্গে তো...সে সৎ মায়েও এমন করে না—হবে না কেন বলো? ভাই নেই—সম্পত্তিতে বাবার হকটা..."

হঠাৎ থেমে গেল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে বলল—"ছাখো! কী বলতে কি কথা এসে পড়ছে। কোথায় ছিলাম?"

"বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল তোমার?"

—তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওর মুখেই প্রথম ওর আসল পরিচয় শুনে যাচ্ছিল বলে প্রশ্নটা আপনা হতেই অন্যমনস্কভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল রঘুর।

একটু বেদনার হাসি ফুটল থাকোমণির অধরে, বলল—"ওটা লুকুতে হয়েছে বলে এটাও লুকুতাম—কপালের সিঁদুর নিজের হাতে মুছে?"

"মাফ করো আমায় মণি, ভুল হয়ে গেছে।" কাতর হয়ে ওর একটা হাত নিজের মুঠোয় ধরে নিল রঘু। বলল—"বলো। তারপর?"

"কোথায় যেন বলছিলাম?"—আরম্ভ করল থাকোমণি—"হ্যাঁ, পিসির ব্যবহার একেবারেই উলটে গেল। আমার কিন্তু তখন ঠিক হয়ে গেছে—ওবাড়িতে আর থাকা চলবে না আমার। ঐ ভয়, তুমি আসা একরকম বন্ধ করে দিয়েছ, কিন্তু যত দেরি করে আস, ততই খারাপ মেজাজে, পিসির সঙ্গে ঝগড়াটা ততই ঘোরালো হয়ে উঠে—যদি রাগের মাথায় পিসি বলেই ফেলে কথাটা। আর একটা ভয়, গয়নার বাকসটা একদিন না একদিন বের করিয়ে দেখবেই—কমে কমে খান পাঁচেক দাঁড়িয়েছে, ও কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইবে না—হয়তো জোর করে রেখেই দেবে। ও নিজের জন্যে নেবে না সে-বিশ্বাস আমার ছিল এতদিন। মা মারা যাওয়ার পর মেয়ের বাড়া করে মানুষ করেছে আমায়—কিন্তু যে কথাটা ঘুণাক্ষরেও বের না করতে ওই আমায় একদিন

মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মা কালীর পা ছুঁয়ে শপথ করিয়েছিল—সে কথাটা নিজেই বের করে দেবে শুনে অবধি আমার ভয় হোল, তাহলে ও কতখানি বদলে গেছে। তোমায় বলে দেওয়া নিয়েই আসল ভয়, তাই থেকে গয়নাতেও এসে পড়ল—যদি হাত করেই নেয়, তা হলে তোমায় হারাবার সঙ্গে গয়নাগুলোও খুইয়ে আমি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ব। কাকে বলি, কি করি! সে যে দুটো দিন কী করে কাটল—একেবারে পাগলের মতন হয়ে পড়লাম আমি। আরও সব ব্যাপার হতে লাগল, সেও এই রকম একটা সন্দেহ এসে পড়াতেই। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে যতই মুখ বন্ধ করে থাকি—অভিমানও যে তার সঙ্গে থাকে না এমন নয়—ঐ পিসিই সব করেছে তো একসময়—সব মিলিয়ে যতই বোবা হয়ে যাই, পিসির দরদ ততই যায় বেড়ে—কথা কওয়াবার চেষ্টা, মিষ্টি কথা। ফল হয় উল্টো, তবে কি ভুলিয়ে-ভালিয়ে গয়না কটা হাতাবার মতলব ?”

ক্রমেই আরও দিশেহারা হয়ে পড়ছি। থাকা এখানে চলবে না। কিন্তু যাই বা কোথায়—কি করে? গেরস্তর বৌ একা কখনও বাড়ির বাইরে পা দিইনি· হঠাৎ থেমে গিয়ে ওর দিকে বলল—“এরপরে তুমিই বলতে পারবে।”

রঘু একটু চমকে উঠেই বলল—“আমি। আমি কি বলব ?”

“আসা বন্ধ করে দেওয়ার পর কয়েকদিন পরে তোমার একটা লোক আমার সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত দিন ওৎ পেতে থেকে সন্ধ্যের পর। পিসি সমস্ত দিনের পর কি একটা কাজে বাইরে গেছে। ভৈরবও মাঠ থেকে ফেরেনি, চুপিসাড়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার একটা চিঠি দিল। লিখেছ অসুখে পড়ে রয়েছ, কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে। টাকা আর হাতে কবে থেকেছে—সামান্য যে কটা নগদ ছিল, তা ও নেবেই—তা হাত ছাড়া না করে পাথর-বসানো আংটিটা দিয়ে দিই। · পেয়েছিলে সেটা ? কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তাও তো জানি না, তাই বলছিলাম—পরপর তুমিই বলতে পারবে। পেয়েছিলে সে আংটি ?”

রঘুর মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল। বলল—“আর লজ্জা দিয়ে কি হবে ? বলে চলো।” একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

থাকোমণি আবার শুরু করল—“যখন মনের এই রকম অবস্থা, সেই লোকটা আবার ঘাঁৎ বুঝে আমার সঙ্গে দেখা করল···”

"আবার!"—চমকেই উঠল রঘু একটু। দোষ স্খালনের স্বরেই বলল—"কৈ, আমি আর পাঠাইনি তো—বিশ্বাস করো..."

"চিঠিও ছিল না এদিনকে।"—নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জানাল থাকোমণি। বলল—"চাইতে জানাল অসুখটা একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় চিঠি দিতে পারেনি। চেনা হয়ে গেছে তো—এমনিই পাঠিয়ে দিয়েছে।"

আমার তখন তো সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার অবস্থা নেই। পালাতে হবে, তোমার কাছে যাওয়ারই লোক পেয়ে গেছি—অসুখের কথাতেও মনটা খারাপই হয়ে গেছে. সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, যা একটু সম্বল আছে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উঠতে পারব—এইটাই আমার কাছে তখন সবচেয়ে বড় কথা।

দুপুরের ব্যাপার সেদিন। ওকে বললাম—সত্য সত্য দিনের বেলায় হবে না, ও যেন একেবারে মাঝ রাতের দিকে আসে, আমি সব জোগাড় করে রাখব। আমার ঘরের পেছনে তরিতরকারির বাগানটা যত্ন তদারকের অভাবে আগাছার জঙ্গল হয়ে গেছে। ঠিক হোল দুপুর রাতে ও জানলার নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, জানলা খোলাই থাকবে আমার, পিসি আর ভৈরবকাকা ঘুমিয়ে পড়ে বাড়ি নিষুতি হয়ে পড়লে, জানলায় এসে ওকে ইসারা করব, তারপর খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

সেদিন বিকেল থেকেই দুর্যোগের লক্ষণ। আকাশে মেঘের চলাচল, তার সঙ্গে একটা যে হাওয়া উঠেছিল, সেটা বেড়েই যেতে লাগল রাত এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে। বামনঠাকরুণ সকাল সকাল রান্নার পাট সেরে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে চলে গেল, আমরাও শুয়ে পড়লাম।

দুদিন থেকে ডেকে কথা বলে তেমন সাড়া পাচ্ছে না। সেদিনও খেতে ডাকলে শরীর খারাপের ছুতো করে যেতেই চাইনি. একটা যে কিছু এঁচে রেখেছি, পিসি নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল, সর্বদাই যেন চোখে চোখে রেখেছিল আমায়। তুমি একেবারেই আসা বন্ধ করার পর পাশের ঘরেই শুতো এদানি, বড় বেশী নাক ডা'কে বলে আমার ঘরে শুতে না পেরে। তবে মাঝখানে একটা দোর ফুটিয়ে নিয়েছিল, যতক্ষণ জেগে ছিল, কয়েকবারই সাড়া নিলে—থাকো ঘুমুলি?...ঘুমিয়ে পড়...কী যে হবে আজ রাত্তিরে'! যেন জোর করে নিজেকেই জাগিয়ে রাখবার জন্যে। তারপর নাক ডাকার শব্দ হোল। খানিকটা সময় যেতে দিলাম, নাক ডাকার শব্দ বেড়ে যাচ্ছে—এক সময় আস্তে আস্তে

উঠে জানলার ধারে চলে গেলাম আসেনি লোকটা—কী যেন নামটা বলেছিল সে ··।

'বিলেস—রঘু জুগিয়ে দিল। ফোঁস করে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল নাক দিয়ে।

থাকোমণি বলল—"হাঁ, বিলেস। দেখলাম আসেনি তখনও। ঘুম ছিল না চোখে, মনটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। বিছানাতেই খানিকটা ছটপট করে আবার জানলার ধারে গিয়ে ওকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে বারান্দায় বসে ভাবছি কি করব, পিসি লণ্ঠন হাতে ক'রে বেরিয়ে এল। তুই এখানে! এই দুষমণ রাত!' বললাম, 'ঘুম হচ্ছে না।' 'হবে ঘুম। বলে হাতটা ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। আরও ঘন ঘন সাড়া নেওয়া। দিয়ে যেতে যেতে একসময় আমি ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দিলে, উঠে এসে সাড়া নিলে, আস্তে আস্তে, পাছে ভেঙে যায় ঘুম, চোখে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেখলেও তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি এবার আরও বেশিক্ষণ নাক ডাকতে দিলাম। বেশ বেড়ে উঠল, জানলার ধারে চলে গেলাম। বিলেস এসে গেছে, বললাম—'খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে। আমার সব ঠিক করাই ছিল গয়না কটা আর কিছু টাকা, নোটে, একটা গেঁজেয় তোষকের নিচে রাখা, বের করে নিয়ে পেটকাপড়ে গুঁজে খুব আস্তে আস্তে গিয়ে খিড়কির দোর খুলে বেরিয়ে পড়লাম, বিলেস দাঁড়িয়েও ছিল।"

"এলে বেরিয়ে তুমি!! ও লোকটার অকরণীয় হেন কাজ নেই!" একেবারে তদ্গত হয়ে শুনতে শুনতে শিউরে উঠে বলল রঘু।

থাকোমণি একটু চেয়ে দেখল ওর দিকে, যেন মনশ্চক্ষে বিপদটা দেখে নিল একবার, তারপর সহজ গলাতেই বলল—"তাই নাকি? আমার তো তখন ওসব ভাববার ক্ষমতা নেই। তবে এখন তুমি বলতে মনে পড়ছে, আমিও সঙ্গে যাব বলতে একটু যেন হকচকিয়ে চুপ করে যায়—তখনই কিন্তু সামলে নিয়ে যেন খুসি হয়েই বলল—'আপনি নিজে যাবেন? বেশ তো, সেত আরও ভালো।'

"বললে তো?"—আতঙ্কের স্বরেই প্রশ্ন করল রঘু।

থাকোমণি সেই রকম সহজ কণ্ঠেই উত্তর করল—"বলেছিল বৈকি। এখন মনে পড়ছে। তারপর শোনই না।

খিড়কি থেকে আমরা গোয়ালঘরের পেছনে কলাবাগানের ভেতর চলে

গেলাম। বাগান ছেড়ে নিধু মালাকারের ঘর, সামনে ওদের ডোবা। দুটোই বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চললাম আমরা। তুমি এদানি ওদিকে যাওনি। গাঁয়ে শেষ বাড়িই ওদের। নজরে পড়ে যাওয়ার ভয় ওদেরই, আকাশে ঘন ঘন ঝিলিক দিতেও আরম্ভ করেছে, বিলেসকে টুকে দিয়ে আমরা বাড়ির সামনেটা ঝোপঝাড়ের আড়াল হয়ে এগিয়ে গেলাম। বাড়িটাও তো···"

রঘু বাধা দিয়ে একটু অবান্তরভাবেই প্রশ্ন করল—"নিধের এখনও সে দোষগুলো আছে?"

"কি দোষ?" একটু অপ্রতিভ হয়ে নিয়ে চাইল থাকোমণি।

"পেশাদার সিঁদেলই তো, আরও নানা দোষ। তোমার স্বামী-দেবতাটির মাথায় কবার হ'ত বুলিয়েছেন সে সব দিনে" মৃদু হেসে বলল রঘু।

"হয়েছে। একসঙ্গে নাম করতে হবে না।"—রাগ করল থাকো, বলল—"স্বামী দেবতা নিজের পয়সা খরচ করেছেন, ভালো-মন্দ যেভাবে হোক। কার বলবার কি আছে?"—একটু গায়ে গা ঘেঁষে কথাটা বলে আবার সরে দাঁড়াল, বলল—"শুনে যাও, সেসব বাজে পুরনো কথা তুলতে হবে না। কি বলছিলাম?—হ্যাঁ, মালাকারের বাড়িটা পেরিয়ে গেলাম আমরা। বিষ্টিটা আরম্ভ হয়ে গেছে, ঝড়টাও আরও গেছে বেড়ে, তেমনি আকাশের ডাক আর বিদ্যুৎ। কখনও তো আসিনি এদিকে, তবু মনে হল আমরা গ্রামটা ছাড়িয়ে বাইরে এসে পড়েছি। একটা বেশ ফাঁকা মাঠ, তবে চষা নয়, ফসল তোলার পর অনেকদিন ছাড়া থাকলে, যেমন হয়, ঘাস জন্মে গেছে। এতক্ষণ নিশিতে পাওয়ার মতন একটানা চলে আসছিলাম—ছোটখাটো ডাল পালা ভেঙেও পড়েছে, হুঁস হয়নি, এগিয়ে গেছি। এবার বিদ্যুতের ঝলকে ফাঁকা মাঠ দেখে প্রথম গা ছমছম করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—"এবার কোনদিকে যেতে হবে? আমার তো জানা নেই—এতটাও চলে এসেছি ঝোঁকের মাথায়।'

বিলাস বললে—'ভয় নেই, আমার তো জানা আছে। যেতে হবে সোজা মাঠ পেরিয়ে ঐ আম বাগানের মধ্যে ঢুকতে হবে। তা আপনি এক কাজ করুন—যা এনেছেন সঙ্গে, আমায় দিয়ে দিন। বাগানটার বদনাম আছে। ওসব ব্যাটাছেলের কাছে থাকলেই ভালো।'

রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। এই সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠে ওর মুখের ওপরও নজর পড়ে গেল। মাথায় বড় বড় চুল জলেতে ভিজে গিয়ে যেন আরও

কিরকম দেখাচ্ছে। তবু মেয়েছেলের সোনাদানার মায়া, আমি বললাম—'এখন বের করতে গেলে বিষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। নোটই তো, একটু ধরন হলে না হয় দিয়ে দেবো।'

জিজ্ঞেস করলে—'আর, গয়নাটয়না নেই? কার ভরসায় রেখে এলেন সেখানে?'

বললাম—পেসাদী পিসিই তো রাখে ওগুলো, তবু দু-একখানা বা সরিয়ে এনেছি, একসঙ্গে দিয়ে দোবো।'

'তবে তাই দেবেন আমায়?'—মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ভালো করে, তবে গলার আওয়াজে মনে হোল যেন মনের মতন হয়নি কথাটা। কিন্তু তখন আমার ওদিকে ততটা খেয়াল নেই, পা বাড়ালাম। চারিদিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফাঁকা মাঠে—ঝড়-বিষ্টির দাপটটাও আরও বেড়েছে। বেশ অনেকখানি গিয়ে বাগানটা পেলাম। যেন জমাট অন্ধকারের চাপ একটা। গরুর গাড়ি যেতে পারে এই রকম একটা কাঁচা রাস্তা ভেতরের দিকে চলে গেছে। সামনে এসে পড়ে আবার দাঁড়াল বিলেস, বললে—'যা আছে দিয়ে দিলে পারতেন আমায়। বললাম না? বাগনটার বদনাম আছে। অবশ্য তার ওষুধও আছে আমার সঙ্গে—যার কাছেই থাকুক ক্ষেতি নেই—সামনে এলেই এই...'

ভিজে জামাটা তুলে কাপড়ের কষি থেকে একটা ছোরা বের করলে, বিদ্যুতে ঝকমকিয়ে উঠল ছোরাটা—"

"উস, কী ভুলটাই যে করেছিলে!" চাপবার চেষ্টা করলেও আওয়াজটা একটু উঠেই পড়ল রঘুর। থাকো বলল—"ভুলে যাচ্ছ, আমি তো সামনেই রয়েছি তোমার।"

একটু হাসবার চেষ্টা করল, তারপর গম্ভীর হয়ে পড়েই বলল—"কী যে ভুল করে বসেছি, এতক্ষণে আমার হুঁস হোল, চকমকে প্রায় হাতখানেকের ছোরাটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে আমার। বললাম—'তা হলে তুমিই রাখো সেই ভালো!'

একটু সরে দাঁড়িয়ে পেটকাপড়ের ভেতর থেকে টাকা-গয়না শুদ্ধ সমস্ত গেঁজেটা খুলে নিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—'আর কিছু নেই আমার কাছে কিন্তু। কোন ভয় নেই তো আর আমার?"

বলল—'না, ভয় কিসের? আমি রয়েছি। মেয়েছেলে, ঝাড়া হাতপা

থাকাই ভালো, তাই নিয়ে রাখলাম'। আমার হাতের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল —'রুলি জোড়াও হাতে না থাকলেই ভালো।'

আমার তখন সারা শরীর ঝিমঝিম করছে ভয়ে, রুলি দুটো খুলে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ', তোমার কথাই ঠিক। আর কিছু রইল না তো ভয়ের?'

খোসামোদ করে নিজে হতেও বললাম—'ঠিক বলেছ। এবার আমি নিশ্চিন্দি। তুমি রয়েছ, বিশ্বাসী বন্ধু বলেই পাঠিয়েছেন তোমায়।' জিজ্ঞেস করলাম—"আর কতটা পথ হবে?'

বলল—'কিছুটা আছে এখনও। কোশ চারেক পথ, আমরা প্রায় আদ্দেকটা এসেছি।'

তারপর একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল—'থাক, আমবাগানের পথটা ছেড়েই দিই। ঝড়টা যে রকম মাতামাতি লাগিয়েছে, ডালটাল ভেঙে পড়তে কতক্ষণ? এটাকে কাটিয়ে একটু ঘুরে যাই চলুন--একটু না হয় বিলম্বই হবে।'

বিদ্যুতের আলোয় দেখে দেখে আমরা বাগানটার পাশ দিয়ে এগুলাম। ফুরুতে চায় কি সে পেল্লায় বাগানের বেড়?…"

রঘু ভ্রূ চেপে কি যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল, বলল—'কোন্ বাগান? বাঘ-আঁচড়ায় যেতে অতবড় আমবাগান তো আছে ব'লে মনে হয় না। উঃ, কী ফাঁড়াটাই গেছে সেদিন।'

থাকো আবার সেই রকম সহজ কণ্ঠে বলল—"সর্বস্ব তুলে দিয়ে তখন প্রাণটুকু হাতে নিয়ে চলেছি, কারুর মুখেই আর কথা নেই। দুর্যোগ? অমন দুর্যোগ জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাড়তে বাড়তে তখন এমন অবস্থা, এক একবার ঝড়ের দমকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেবে; নেহাৎ গাছগুলোর পাশে পাশে রয়েছি বলে কোনওরকমে পা-পা করে যাচ্ছি এগিয়ে একটু। তেমনি বিষ্টি, তেমনি বাজের গর্জন। বাঁদিকে মাঠের মাঝখানে একটা তাল গাছ বাজ পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ডানদিকে গাছের ডালগুলো মটমট করে ভেঙে পড়ছে। একটু দাঁড়াবার আশ্রয় নেই বলেই আমরা গায়ে সব শক্তি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এই করে এদিকেও যখন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলেছি, বাগানটা পেরিয়ে আমরা আবার একটা মাঠে এসে পড়লাম। সামনে বেশ একটা বড় জলাও, খুব ঢেউ উঠছে, বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়।…তোমার কি তাহলে মনে হয়, বাঘ-আঁচড়ার পথই নয় ওটা?"

ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল রঘুকে। খুবই অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল রঘু একটু

চকিত হয়ে উঠেই বলল—"এঁ্যা, মোটেই নয়, তাই মিলিয়ে দেখছিলাম। উঃ, কী ফাঁড়াটা গেছে সে রাত্তিরে!"

"সে কথা একশ'বার। তবে, কী নিশ্চিহ্ন ক'রে ফাঁড়া কাটিয়েও যে দিলেন তিনি! আজও দেখছি, সেদিনও দেখেছিলাম—দয়া যখন করেন…'

অভিভূত হয়ে কণ্ঠস্বর দ্রব হয়ে এল, আঁচলটা তুলে চোখে চাপল থাকোমণি। রঘু পিঠে বাঁহাতটা রাখল আলগাভাবে, বলল—তখন তেমনি করেই করেন বৈকি; করেন না?"

কিছুক্ষণ একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল দুজনে, পরে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকো আবার শুরু করল—"ঝড়টা তখন অনেকটা কমে এসেছে, মেঘেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরে শেষরাতের চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। জলাটার ধার দিয়ে এগুতে এগুতে আমরা একটা কি বড় গাছের নীচে একটা ঘরের কাছাকাছি এসে পড়লাম। পাকা একটা ছোট ঘর। যতদূর দৃষ্টি যায় আর কোথাও কিছু নেই। বিলেস বলল—'ওটা মন্দির একটা, ভেতরে গিয়ে আমরা কাপড় জামা নিংড়ে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিগে। দুর্যোগটা একেবারে কেটে গেলে বেরিয়ে পড়ব।'

আমার যেন কিরকম বোধ হতে লাগল। সেই ভয়-ভয় ভাবটা আবার ফিরে এল, বললাম—'একটানা চলেই যাই চলো; ভেজবার যা তাতো ভিজেই গেছি।'

একটু জিদ করেই বলল—'না, চলুন। পথে আশ্রয় ছিল অথচ এইভাবে একটানা নিয়ে এসেছি—তিনিই বা কি বলবেন আমায়? চলুন!'

আমার অবস্থা বুঝতেই পার, ছোরাটা দেখবার পর থেকে ওর কথায় না বলবার ক্ষমতা নেই আমার। "বেশ চলো' বলে দুর্গা নাম জপ করতে করতে চললাম পেছনে পেছনে। খোসামোদটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, বেশ চলো, তাঁর বন্ধুই যখন রয়েছে সঙ্গে।'

ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইটের ছাতে খুব পুরনো একটা ঘর। ছোট দরজাটা আধ-ভাঙা হয়ে ঝুলে পড়েছে, চৌকাঠটাও পচে গেছে। একটা বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখলাম—ঠাকুর কোনও নেই। বললামও ওকে। বলল—'ছিল, শিবলিঙ্গ গাঁয়ের লোকে তুলে দিয়ে গেছে।' তারপর ভেতরটা দেখিয়ে বলল—'যান, কোণে গিয়ে জামা কাপড় নিংড়ে নিন ভালো করে।' ওর চোখের দৃষ্টিটা একেবারেই ভালো লাগছে না। হঠাৎ নিরুপায় হয়ে আমি

যেন মরিয়া হয়ে পড়লাম। কোথা থেকে একটা বুদ্ধিও মাথায় জুগিয়ে গেল, বললাম—'তুমিই আগে যাও, ভেতরটা একেবারে অন্ধকার—আমার ভয় করছে—ভয়টা তাহলে ভেঙ্গে যাবে।'—ঠিক করে নিয়েছি, ভাঙা হোক যাই হোক, ভেতরে গেলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে শেকলটা তুলে দিয়ে ছুটব। ঘর রয়েছে যখন—হয়তো কোন ঠাকুরও ছিলেন এককালে, তখন কাছে পিঠে গ্রামও আছে নিশ্চয়।

কি একটু ভাবল বিলেস, তারপর বলল—'বেশ যখন বলছেন—মনিবেরই পরিবার তো⋯'

চলে গেল ভেতরে। আওয়াজে বুঝলাম নিংড়ুচ্ছে কাপড়। সে-যে কী গেছে ঐটুকু সময় আমার! সময় যাচ্ছে, এক লহমার এদিক ওদিকে কী হয়ে যাবে! অথচ সাহস হচ্ছে না যে এগিয়ে তাড়তাড়ি শেকলটা তুলে দিই। নিংড়ুতে নিংড়ুতে এগিয়েও এল দরজার হাতখানেক ভেতরে। বলল—'আসুন এবার।'

বললাম—'তুমি এসো বেরিয়ে তবে তো।'

আবার মরিয়া হয়ে দেছি, বললামও একটু হুকুমের টোনেই।

চটে গেল এবার—'খালি অবিশ্বাস। আবার ভিজতে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে? তবে⋯' —বলে কোমরের ছোরার বাঁটটা মুঠিয়ে ধরে এগিয়েছে, কড় কড় করে শব্দ হয়ে গাছের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ল ছাতের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছাতটাও। একেবারে বিলেসকেও নিয়ে। 'মাগো।' বলে একটা চিৎকার, তারপরই সব শেষ।

'চুপ করল থাকোমণি; এবার যেন সমস্ত দৃশ্যটার স্মৃতিতে সম্মোহিত হয়েই, আর, কি হোতে পারত যেন তার আতঙ্কেও। রঘুও যেন সমস্ত ঘটনাটুকু প্রত্যক্ষই করছে। একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—"উঃ। তারপর?"

বেশ সহজ ভাবটা ফিরে এসেছে থাকোমণির, অতীতের ঘটনাটা একেবারে সামনে এসে পড়েছিল, আবার অতীতে চলে গেছে। বলল—"তুমি আমায় ভীতু বলল বরাবর, তাই না? সে রাত্তিরে আমায় দেখা উচিত ছিল। ঝড়টা কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। আকাশও বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে একেবারে নীচের দিকে চাঁদের ফালিটুকু রাঙা হয়ে উঠেছে। নির্জন, একটা লোক ছিল, সেও নেই। তারপরেই নজর পড়ল জলার ধারে পোড়া কাঠ কতগুলো ছড়ানো রয়েছে। জায়গাটা তাহলে শ্মশান!

একা শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই একটা লোক মরে রয়েছে—এই মিনিট কয়েক আগে পর্যন্ত জীবন্ত ছিল! আমার কিন্তু একেবারে ভয় নেই। এখন মনে হবে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে যতটুকু গা ছমছম করছে ততটুকুও নয়। এটা যে কি করে সম্ভব হয়েছিল তখন, তা এখনও বুঝতে পারি না। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বিলেসের লাসটা পড়েছে এমনভাবে যে কোমরের ওপরের ধড়টা ভেতরে পড়ে একরাশ ইঁটে চাপা পড়ে গেছে। বাকিটা এদিকেই। অতগুলো না হোক, তবু ইঁট রয়েছে এদিকে, তাছাড়া একটা কড়ি আড়াআড়ি পড়েছে কোমর চেপে, দোরের কাছেই। আমি ইঁটগুলো সরিয়ে কড়িকাঠটাও সরিয়ে দিলাম। ছোট ঘরের কড়িকাঠ মোটা নয়, পচেও গেছে কিছু কিছু। সব পরিষ্কার করে গেঁজেটা খুলে নিলাম ওর কোমর থেকে। নীচের দিকে পড়েছিল—তবু দুটো গয়না ভেঙে গেছে, বাকিকটা একটু একটু তোবড়ানো। নোট ছিল শ'খানেকের কিছু বেশি, তার মধ্যে একটা নম্বরী একশ টাকার। একটা লম্বা টিনের কৌটোয় রাখি। ভেজেনি। যতক্ষণে আমার এদিকে শেষ হয়েছে ততক্ষণে ফর্সাও হয়ে এসেছে। বাইরে কাপড়জামা নিংড়ে, গেঁজেটা আবার পেটকাপড়ের নীচে বেঁধে তোয়ের হয়ে নিলাম। চারিদিকে মাঠ আর জঙ্গল। তবে একটা শ্মশান যখন রয়েছে, তখন গ্রাম কাছাকাছি থাকবেই। দু'তিনটে যে সরু পায়েহাঁটা পথ এসে মিশেছে জায়গাটায়, তার একটা ধরে এগুলাম। কপাল দোষে মনে হোল সবচেয়ে দূর গ্রামের পথটাই ধরে থাকব। যখন পৌঁছুলাম, তখন মাথার ওপর সূয্যি অনেকখানি উঠে এসেছে। তছনছ করে দিয়ে গেছে গ্রামটা, তারই মধ্যে সামনে ঢুকতেই যে বাড়িটা পেলাম তাইতে উঠে পড়লাম আমি।··· আজ এই পর্যন্ত থাক।"

চুপ করল থাকোমণি।

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছ না?"—রঘু বলল।

"অমন ভয়ংকর রাত তো জীবনে আর আসে নি, সবটা আবার মনে পড়ে গেল তো। বাইরের দিকে চেয়েই বলে যাচ্ছিল, ঘুরে চাইল ওর দিকে থাকো।

"থাক তবে।"—বারণ করল রঘু। বলল—"তুমি শুয়ে পড়গে।"

"আর তুমি? রাতও তো হয়েছে অনেক।"

"থাকি বাইরে একটু। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, ঘুম হবে না।"

'আমারও তো ঐ অবস্থা।'

"বাঃ, তোমার তো গরম হওয়ার সঙ্গে ভেজাও হয়েছে।"—হেসে একটা হালকা রসিকতা করল রঘু। বলল—'না', দুজনে একসঙ্গে থাকলে শোনবারই ইচ্ছে হবে তো। পাখা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ো গে, লক্ষ্মীটি।

"তুমিও দেরি কোর না, লক্ষ্মীটি।"

যেতে যেতে ফিরে বলে একটু হেসেই ফেলল থাকোমণি। রঘুও ফেলল হেসে।

অনভ্যাসের লজ্জায় একটু তাড়াতাড়িই ভেতরে চলে গেল থাকোমণি।

॥ উনত্রিশ ॥

হঠাৎ, কতো আগে সেই গোড়ার রাতগুলো থেকে একটা যেন ফিরে এসেছে একটি মিষ্টি শব্দের আদান-প্রদানে, মাঝখানের এই কতদিনের কত রাতের দুঃসহ গ্লানি সব একেবারেই মুছে দিয়ে।

ওরা উঠল অনেক দেরি করেই। তবে দুজনেই বেশ প্রফুল্ল। রঘুই একটু আগে উঠেছে, থাকোমণি ঘুম ভেঙেই তাকে দেখে বলে উঠল—"হ্যাগো, এবার তো আমরা বাড়ি যাব?"

সদ্য ঘুমভাঙা চোখদুটো উজ্জল হয়ে উঠেছে।

রঘু বিছানাতেই পা ঝুলিয়ে বসে ধীরে ধীরে সিগারেট টানছিল, নির্লিপ্ত-কণ্ঠে বলল—"এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

গালে বাঁহাতের তর্জনীটা চেপে ধরল থাকো, চোখ কপালে তুলে বলল—"ওমা, কি বলছ তুমি। তাড়াতাড়ি নেই? আজ বছরখানেক ধরে যারা নাকি বাড়ির মুখ দ্যাখেনি! এমন ছিষ্টিছাড়া কথা..."

হেসে ফেলল রঘু—সেই পুরনোদিনের নূতন থাকোমণিকে আর একবার এনে ফেলবার জন্যে রহস্যটুকু—একটু বেফাঁস কথা বললেই—সেই চোখ কপালে তোলা, নিজের গাল টিপে ধরার সেই মুদ্রাদোষ; একটু চেয়ে থেকে হেসে ফেলে বলল—"হয়েছে হয়েছে; এসো বোস দিকিন এখানে এসে। বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ করবার জন্যে বসে আছি সেই থেকে, তা যা ঘুম!"

"আমি বাড়ির স্বপ্নই তো দেখছিলাম।"—আপত্তি জানিয়ে এমন ভ্রু-কুঁচকে দৃষ্টি হেনে পাশে এসে বসল থাকোমণি যে, রঘু একটু দুলেই হেসে উঠল। ওর

পিঠে হাত দিয়ে মুখটা ঝুঁকিয়ে বলল—"তাহলে আর কি? বেশ তো বাড়িতেই ছিলে।"

ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়ে বলল—"না সেকথা নয়। যেতে তো হবেই—আর একদণ্ড মন টেকে এখানে? আমি তোমার ঘুম ভাঙবার জন্যেই বসে আছি। তুমি এক কাজ করো। চান-টান সব সেরে নাও, আমি ততক্ষণ একবার ইষ্টিশানে গিয়ে গাড়ির সময়টা জেনে আসি। আমার চান বাদে আর সব হয়ে গেছে, এক কাপ চা পর্যন্ত।"

"আজই যাবে? এখুনি?···একটা কথা ছিল। যদি রাখো।"—ভঙ্গি বদলে একটু মিনতির স্বরেই বলল থাকো।

কৌতুকে রঘুর চোখদুটো আবার চিক-চিক করে উঠল, মুখের দিকে চেয়ে বলল—"তোমার অন্ত পাওয়া ভার। এই—'তাড়াতাড়ি কিসের?'—বলতে এক ভাব, সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টিশনে গাড়ি দেখতে যাচ্ছি বলতে···?

"মাত্র একটা দিন, তাইতেই হয়ে যাবে"—আবদারে অল্প একটু গড়িয়ে পড়ল গায়ে থাকোমণি, বলল—আগ্রা, এটা নাকি একটা দেখবার মতন জায়গা—দেশবিদেশ থেকে দেখতে আসে সবাই—তেরো নম্বরে আমাদেরই মতন দুজন বাঙালী এসে রয়েছে—বৌটি বলতে গেলে ছেলেমানুষই—কাল আলাপ হোল—দেখতেই বেরিয়েছে দুজনে—সব দেখা হয়ে গেছে—কাল তাজমহল দেখতে গিয়েছিল। আমার শুধু নাম শোনা আছে মাত্র—বলছিল সে নাকি একটা তীর্থস্থান—কোন্ বাদশার বেগম মারা যেতে—নাকি বড্ড ভালবাসতো তাকে বাদশা···"

—বলতে বলতে রঘুর বুকে মুখটা গুঁজে দিল থাকোমণি। অশ্রু নেমে এসেছে চোখে। নিঃশব্দে কেঁদেই যেতে দিল রঘু। নিজের মনটা স্মৃতির ভারে টনটন করে উঠেছে, কোথায় সে বাদশার সোহাগ, কোথায় তার নিজের নির্যাতন।

একটু পরে বুকে একটু চেপে নিয়ে বলল—"এ আর এমন কি শক্ত কথা মণি? যাব দেখতে। আমারও হয়নি দেখা কখনও, নাম শুনেছি অনেক।"

একটু থেমে, সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—"তোমার বাকি গল্পটা শোনার ইচ্ছে ছিল। তা নয় হবেখন পরে। বেশ, তাই ঠিক থাক তবে। ইষ্টিশানটা আমি হয়েই আসি ততক্ষণ।"

ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সমস্ত দিনের ফুরোনে একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এদিকে যা দেখবার সব দেখেশুনে সন্ধ্যার সময় তাজমহলে এসে উঠল। পূর্ণিমা বা তার কাছাকাছি না হলেও জ্যোৎস্না-রাত্রিই। গাইডের সাহায্যে সব ভালো করে দেখেশুনে ওরা একটা চাতালে বসল। সমস্ত দিনের পর্যটনে ক্লান্ত, তার ওপর আগ্রার যেন সবটুকুই বিষণ্ণতা। এই এত নামকরা তাজমহল পর্যন্ত। শরীরের ক্লান্তির সঙ্গে মনটাও ভার হয়ে রয়েছে, বিশেষ করে থাকোমণির। কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত দু'একটা এদিক-ওদিক মন্তব্য ছাড়া ওরা চুপ করেই বসে রইল। গাইডকেই বলে দিয়েছিল রঘু, ক্যান্টিন-থেকে একটা লোক একটা প্লেটে করে চায়ের সরঞ্জাম আর টোষ্ট নিয়ে এসে সার্ভ করে গেল। ওরা অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক গল্পর সঙ্গে শেষ করল। রঘু রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল—"হাঁ তারপর? এবার বলো, নিশ্চিন্দি হয়ে শোনা যাক।"

ট্যাক্সিতে ছাড়াছাড়া কিছু গল্প হয়েছে থাকোমণির—সেদিন গ্রামে পৌঁছুবার পর থেকে। সে-রাত্রের মত উগ্রতার কিছুই নেই। গল্পর চেহারা সাদামাটা। সে-রাত্রের দুর্যোগে কত লোক চাপা পড়ে মারা গেছে, কত লোক ওর মতোই ঘর ছেড়ে ছিটকে পড়েছে, পথে যেতে যেতেই থাকোমণি যে একটা কাহিনী রচনা করে রেখেছিল বাড়ির লোকে বিশ্বাস করেই নেয়। বাঘ-আঁচড়ার নামটা আর না থাকো, নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি একটা গ্রামের নাম করে বলে, সেখান থেকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি আসছিল মালীপাড়ায় গোরুর গাড়িতে, রাস্তাতেই ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে গাড়োয়ান আর যার সঙ্গে আসছিল দুজনেই মারা যায়। গাড়িটা একেবারে যায় ভেঙে, একটা বলদ জখম হয়ে পড়ে, একটা পালায়, ও সমস্ত রাত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চলে এখানে এসেছে। বেশ ভালো গৃহস্থই, তাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, সেইদিকেই মন সবার, বেশি জিজ্ঞেসবাদ না করে শুকনো শাড়ি, সায়া দিয়ে নিজেদের গোরুর গাড়ি করে পাঠিয়ে দিল।

মালীপুরের সম্বন্ধের কথাও বলল থাকোমণি। এই প্রথম। তখন পাকিস্থানের কথা বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ায় প্রকৃত সম্বন্ধের দিকটা আর বলা হয়নি। ওঁরা কেউ নয়, এমনকি একজাতও নয়। পাকিস্থান থেকে এনে এইদিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে সমস্তটাই প্রসাদীর বানানো। তবে, বিয়ের আগে দিনকতক সে ছিল সেখানে, তারপর বিয়ের অনেক পরেও সে বার দুই আসে হলধর

বেঁচে থাকতেই। তাকে সবাই জানতো ভালো করেই। ওকে ভালওবাসত সবাই! ছোট সংসারই—কর্তা, গিন্নি, গিন্নির একটি বোন, বালবিধবা, দিদির বাড়িতেই থাকে। একটি ছেলে, থাকোর যখন বিবাহ হয়, তখন ছেলেমানুষই, বছর দশেক বয়েস, বিয়েটা যখন হয় তখন ওসব বোঝবার ক্ষমতা নেই তার। তারপর অবশ্য জানতে পারে কিছু, তবে ওপারের আত্মীয়র বোন, এপারে নিয়ে এসে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই পর্যন্ত। এক জাতেরও যে নয়, সে সব কিছু জানে না। একটু হাঁদা গোছেরও ছেলেটা, থাকোমণির খুব নেওটো হয়ে পড়েছিল কটা দিনে।

থাকোমণি পৌঁছাল সন্ধ্যার সময়। শেষবার যে আসে তারপর ছ-সাত বছর বাদ দিয়ে এই এল। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কর্তা মারা গেছেন। ছেলের অনেকদিন আগেই বিবাহ হয়ে যায়, তাঁর সময়েই। এখন দুটি শিশু সন্তান।

বেশ একটু অবাক হোল ওরা ওকে এ সময়, এভাবে দেখে। এখানে দুটো গল্প চালু করতে হোল থাকোমণিকে। একটা, যা আগের গ্রামে বলে এল, গাড়োয়ানটাও রয়েছে। জানত গিন্নির কাছে এটা চলবে না। তবে গিন্নি চালাক মেয়েছেলে, শ্বশুরবাড়িতে যে একটা অশান্তি চলছে, কিছু কিছু খোঁজ রাখতেন। মুখের পানে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চুপ করে শুনেই গেলেন তখন। তারপর রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়েছে, থাকোমণিকে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি ব্যাপার বল্ দিকিন? আমি তো জানি কিছু কিছু।"

"আর টেঁকতে পারলাম না মাসি, বাবা মারা যেতে শেষপর্যন্ত পেসাদী পিসিমাও বৈরী হয়ে পড়ল, পালিয়ে এলাম তোমার কাছে"—বলে হাঁটু দুটো জড়িয়ে কেঁদে পড়ল থাকোমণি।

চুপ করিয়ে বললেন—'তা বেশ করেছিস, আমরা দুবোনে তিথি করতে বেরুচ্ছি। বুনীর দিকে চাইতে পারতাম না—(বর্ণমালা ওর বোনের নাম)—এখন আবার নিজের কপাল পুড়েছে, আর ভাল লাগে না। ছেলেটা মানুষ হয়েছে, বৌটিও পেয়েছি বেশ কাজের, চালিয়ে নিক দিনকতক। সামনে এবার প্রয়াগে কুম্ভ, একটা বেশ দাঁও পেয়েছি। বেশ ভাল হোল, তুই থাক। তারপর ফিরে এসে বোঝা যাবে।

থাকো আবার কেঁদে পড়ে পা জড়িয়ে ধরে বলল—"আমাকেও নিয়ে চলো মাসি, সব থাকতে আমারও তো কপাল পুড়েছে…"

রাজি করাল।

থাকোমণি চুপ করল। দুটো আঙুলে সিগারেট ধরে বুনছিল রঘু, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে একটা করে টান দিয়ে, প্রশ্ন করল—"তারপর ?"

'না হয় আজ থাকই না এই পর্যন্ত।'...একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব নিয়ে বলল থাকো—"এমন রাতটা নষ্ট করব ?"

চাঁদটা ক্ষয়ে আধখানা হয়ে আকাশের মাঝামাঝি তাজমহলের গুম্বজের ওপর থেকে সরে এসেছে। থাকোমণি একবার দেখে নিয়ে রঘুর দিকে চেয়ে বলল—"সত্যিই, তাহলে পূর্ণিমার রাতে কত সুন্দর হয়ে উঠে, না গা ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে গেল রঘুর বুক থেকে। অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, একটু চকিত হয়ে উঠে বলল—"এ্যাঁ...হাঁ, তা বৈকি।"

ভাবের ঘোর এসে যাওয়ার জন্যে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল থাকোমণি। বলল—"বড় বেশি যেন ভাবচ। আর তো আমরা হয়ে পড়েছি একসঙ্গে, না হয় বলবই বাকিটুকু ?...তাই না হয় শোন। হ্যাঁ, তাই বলি না হয়। এ দিকটা বেশ ভালোও—এই যে আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম। প্রথমে সোজা দক্ষিণেই চলে যাই—রামেশ্বর, ধনুষ্কোটী, কাঞ্চীধাম,—তাকে নাকি আবার দক্ষিণের কাশীধামই বলে। বেশ আনন্দেই কাটল কটা মাস—যতদিন কাটল ওদিকে—একে একে বলব তোমায় শুধু এইদিকে আবার কিছুদিন হোল ফিরে এসে যখন লোকটার কাছে শুনলাম · সে কথা থাক এখন। তোমার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত শোনা হয়নি, তা বলছি। বেশ ফাঁকি দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছ আমায়..."

--একটু আবদারের টোনে, কি আঘাতে কোথায় রঘুর মনটা পড়ে আছে, ফিরিয়ে আনবার জন্য, নিজের অপ্রতিভ ভাবটুকুও কাটিয়ে ওঠবার জন্যে।

একটু হাসল রঘু। বলল—"আমার কথা শুনলে এ জ্যোৎস্নাটুকুও নিভে যাবে মণি।"

ওর পিঠে একটু চাপ দিয়ে সান্ত্বনার স্বরেই বলল—"তবু শুনবে বৈকি, সবটাই যে দুঃখের এমনও নয়। নাও, ওঠো, রাত দশটার মধ্যে ট্যাকসিটাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

॥ ত্রিশ ॥

হোটেলে এসে ভালো করে গা হাত ধুয়ে আহারও সেরে নিল দুজনে। রঘু গিয়ে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল, থাকোমণি বিছানা ঠিক করে, ঘরটাও একটু গুছিয়ে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। বলল—"চুলটা আঁচড়ালেও না ভালো করে। দোব আঁচড়ে আমি?"

"তোমার খারাপ লাগে তো দাও।"—একটু হেসে বলল রঘু।

"অমনি ঠাট্টা!! আমার সব তাতেই ভালো। তবে থাক।"—কথাটুকু বলে, একটু থেমে গিয়ে বলল—"আমি বলছিলাম, তুমি যেন আজ সমস্ত দিন অন্যমনস্ক, ইষ্টিশান থেকে ফেরা অবধি। কোনও দিকে যেন খেয়াল নেই--চুলটা একটু আঁচড়ে নেবে তাও…কেন, এবার তো আমরা বাড়িই যাচ্ছি কেমন…"

"ঠিক বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না এখন মণি।"

"সেকি! কেন? কি হোল? এই কাল বললে—"

"যাব বাড়ি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তবে, এখন সোজাসুজি সেখানে গিয়ে উঠলে বিপদ আছে…"

"কি বিপদ আবার! নিজেদের বাড়ি—দুজনেই রয়েছি…"

"তুমি তখন কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলে—দক্ষিণের তীর্থ থেকে ফিরে এসে এখানে কোথায় কার কাছে কি একটা কথা শুনে অবধি…"

"হ্যাঁ, একদিন বিন্ধ্যাচলে কয়েকজন নাগাসাধুর আশ্রম দেখে ফিরছি, গাড়িতে তাদেরই কথা বলছিলাম আমি, দুজন আধবুড়ী গোছের যাত্রীকে—কেমন ছেলে মানুষের মতন আপনভোলা সাধু সব। তারাও দেখতে যাবে বলে একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে করে শুনছে, একটা লোক সামনে বেঞ্চের কোণে বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ একটু যেন চমকে উঠে বললে—'নাগা সন্ন্যাসীর দল বললে না মণি, তা আছে তারা সেখানে এখনও?'

ওরকম করে ধড়মড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করবার জন্যেই একজন বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—'আপনি যাবেন নাকি দেখতে?'

লোকটা বললে—"যেতে হবে বৈকি। হা-পিত্তেশ করে রয়েছি, যাব না?"

বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—"কিন্তু স্তো-ট্যান ওঁরা ?"

লোকটা বললে—'নগদ পাঁচ হাজার টাকা—বাগিয়ে জটা চেপে ধরতে পারলেই।'

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে গেছি ওর রকমসকম আর বসবার ঢং দেখে। বুড়ি বললেও—"বুঝলাম না তো আপনার কথা বাবা।"

নিজের মাথার ওপর হাতটা ঘুরিয়ে বললে—'বৌকে খুন করে ফেরার হয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে—মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া। এইসব দলেই তো থাকবে। যেতে হবে বৈকি।'

শুনেই মনটা ছাঁৎ করে উঠেছে—যদিও তেমন আর কারণ কি ?—এ ধরনের মিথ্যে ভেকধরা সাধুসন্ন্যাসীর কথা তো কতই শোনা যায় তীর্থ জায়গায়—কিন্তু তারপরেই অন্য বুড়ি, সে চুপ করে শুনছিল, তার মুখের কথা শুনে সর্বশরীর হিম হয়ে গেল। সে বললে—'শুনছিলাম যেন কার মুখে—তাদেরই গাঁয়ের এক গেরস্তর ছেলে, গাঁয়ের নামটা তার মনে নেই, তবে আসামীর নামটা তোমরাই বললে। দিন দশেক হতে চলল। সেই থেকে আমার যে কী অবস্থা গেছে, তোমায় না দেখা পর্যন্ত !

"সন্ধ্যের পরের কথা, গাড়িটা মথুরার আগের ইস্টিশানে পৌঁছুতে লোকটা উঠে কোণটাতে বসেছে।"

"তোমার মালীপুরের মা-মাসীমা ?"—রঘু প্রশ্ন করল।

"ওরা বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই কোন্ সকালে বেরুনো গেছে বিন্ধ্যাচল ছেড়ে, হা-ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দলের আর সবারও ঐ অবস্থা, কেউ জেগে, কেউ ঘুমিয়ে, তবে তারা আমার কথা তো জানে না, মাসি জেগে থাকলে যে কী হোত। হ্যাঁ গা, এখনও যদি টের পায় কেউ।..."—ভীত-উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

রঘু বুকের কাছে টেনে নিল। বলল—"কী আর হবে ? তখন বললাম না তোমায় ? দুজনে একত্র হয়েছি, আর ভয় নেই।" আর একটু বুকে চেপে নিয়ে বলল—"তুমিই তো আমার রক্ষা-কবচ এখন।"

"তবে যে বলছ আবার এখন বাড়ি যাওয়া চলবে না, বিপদ আছে। না বাপু—তোমার কথার যেন আজ কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, বড় এলোমেলো বলছ।"

অনুযোগ-অভিমানে মাথাটা গুঁজে দিল ওর বুকে।

সত্যই তাল রাখতে পারছে না রঘু আজ। সোজা বাড়িতে গিয়ে ওঠার বিপদের কথাটা বলতেই যাচ্ছিল, থাকো কার মুখে কি কথা শুনেছে জিজ্ঞেস করে যে ফলটা হোল—আবার ওর সেই আতঙ্কের ভাব--তাতে আর বলল না বিপদের কথাটা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে নিল প্রসঙ্গটা, তবু, মনের চাঞ্চল্যতার জন্য আর একটু হয়েই গেল ভুল। আগের সব দিনের কথা ভুলে গিয়ে বলে ফেলল—"বাড়িতে কে কেমন কোথায় আছে একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে। তাই মনে করছি আগে একবার বেচুর সঙ্গে দেখা করব—সে কলকাতায়···"

"বেচু !!—কোন বেচু ? —বেচারাম ?···"

একটা ঝাঁকানি দিয়ে রঘুর হাতের আগল থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল থাকো। আতঙ্কে চোখ দুটো ঠেলে আসছে, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। রঘু একেবারে হতভম্ব মেরে গেছে। কি করে যে সামলাবে মাথায় আসছে না। একটা চেষ্টা করল, খুব শান্ত কণ্ঠে বলল—"বেচু আর সে বেচু নেই, মণি···"

বলতে বলতেই হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল থাকোমণি।

রঘুও কি করে সামলাবে ভেবে না পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে আবার একটু জড়িয়ে ধরেই বলল --"তুমি আমার দিকটা তো শোননি এখনও মণি। আজ না হয় সেইটেই শোন। এসব কথা কাল হবে যা হয় !"

পাকিস্থান ছাড়ার পর থেকে সবটা বলে গেল, তবে অনেক নরম করে, যাতে কোন রকম আঘাত না পায় থাকোমণি। পাকিস্থানী সিপাইদের হাতে নির্যাতন বাদই দিল—হুটবিহারীর কথা, এমন কি যাদব দাসের এ দিকের কথাও, যদিও বুঝেছে, বিন্ধ্যাচল থেকে ফিরতে থাকোমণির তারই সঙ্গে হয় দেখা। কলকাতায় এসে তো ভালই ছিল, সেই দিকটাতে জোর দিল, রং ফলালও বেশি। বিশেষ করে তাতে বেচারামের যতখানি ভূমিকা।

শুনতে শুনতে থাকোমণির মুখের ভাবটা নরম হয়ে এসেছে, বলল— "যেমন বললে বেচারামকে সে লোক বলে মনেই হয় না। যা সব শুনতাম আগে !"

"তোমার নিজের মানুষটিকেই কি সেই লোক বলে মনে হয় ?"—একটু হেসে প্রশ্ন করল রঘু। একদিন বেচারামকেই যে কথা বলেছিল, থাকোকেও বলল সেই কথাটা—' কয়লা হাজার ধুলেও রং বদলায় না, বদলায় কখন জান মণি ? পুড়লে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল থাকোমণির, বলল—"আর পোড়ার কথা বলতে হবে না।"

"বেশ তাহলে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করেই যা ঠিক হয় করো।"

॥ একত্রিংশ ॥

রঘুর মনটা যে সমস্ত দিন অত চঞ্চল হ'য়েছিল, সোজা বাড়িতে গিয়ে ওঠাও যে বন্ধ করে দিল, তার গোড়ায় নিতান্ত হাওয়ায়-উড়ে-আসা কয়েকটা কথা শুনে ফেলা।

আজ সমস্ত দিন আগ্রা দেখে বেড়াবে দু'জনে সময় পাবে না, দেশে ফেরবার ট্রেনের সময় জানতে গিয়েছিল স্টেশনে। কলকাতাটা বাদ দিতেই চায়, সুবিধা হ'লে ব্যাণ্ডেল নৈহাটি হয়েই যাবে বেরিয়ে, বাড়ির জন্যে মনটা ছটপট করছে।

এনকোয়ারি আফিসের কাছে লাইনে কয়েকজনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, কানে গেল—"বাঃ আমার বৌ বলে দাবি করলেই হোল অমনি ! আইন নেই, প্রমাণ দিতে··"

চমকে উঠে ফিরে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মিলিয়ে গেল ভিড়ের গোলমালের মধ্যে। যে দু'জনের মধ্যে হচ্ছে, তারা ততক্ষণে গেট পেরিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়েছে। শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠেছিল, তখনই বুঝল— না, তাকে নিয়ে নয়। দু'জন ভদ্রবেশি যুবক, সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ল দুজনে। গাড়িটা ছেড়ে দিল। মনটা কথা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। একটা কাহিনীর ভগ্নাংশ, ভালোমন্দ দুই হ'তে পারে, তবে তার নিজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব মনে হওয়ায় মিলিয়ে গেল মন থেকে। ট্রেন সম্বন্ধে খবর নিল, এখান থেকে ছাড়বার, ব্যাণ্ডেলে পৌঁছে নৈহাটির গাড়ি, তার পরেও। বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। একটা ট্যাক্সিও ঠিক করল সমস্ত দিন ঘুরে দেখবার জন্যে।

এই সব করতে ব্যাপারটা মিলিয়ে গিয়েছিল মন থেকে, এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর কিন্তু আবার এল ফিরে। এবার অন্যরূপে। একটা যে প্রফুল্লতা এসে গিয়েছিল মনে, সম্পূর্ণ নতুন হয়ে নিজেদের পুরানো বাড়িতে উঠবে—তার একটা রঙিন চিত্র—সেটা একেবারে গেল উলটে।...প্রমাণ করতে হবে যে এ-থাকোমণি সেই থাকোমণি...তার আগে পর্যন্ত সে তো স্ত্রীহন্তা রূপেই দাঁড়িয়ে উঠানে...থানার লোক এসেছে... সব কিছুর মধ্যেই সমস্ত দিন চঞ্চল হয়ে রইল মনটা।

তারপর বেচারামের কথা মনে পড়ে গেল। রঘু যেদিন ভোরে খিদিরপুর থেকে পালায়, তার দুদিন আগে দুই বন্ধুতে পার্কে বসে পরামর্শ হয়—প্রসাদী যখন চায় রঘু ফিরে আসুক, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমস্ত পণ ক'রে বাঁচাবে তাকে—তখন সে রঘুর মনিব খিদিরপুরের উকিলের পরামর্শ নিক, আসামী যে ধরা দিতে চায় তার প্রকৃত প্রমাণ দিয়ে। একটা চিঠিও এই মর্মে লেখে ওরা দুজনে মিলে, প্রসাদী বলবে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠিক হয়, প্রথমে রঘুর কথা না বলে অন্য নাম দিয়ে চালাবে সল্লাপরামর্শ, পরে সুধিবা বুঝে, খোলাখুলিভাবে সব পরিচয় দিয়ে রঘুকে নিয়ে আসবে সামনে। তখন সবটাই অন্ধকার, অনিশ্চিত। এখন তো থাকোমণি পাশেই—ঠিক সে-ধরনের ভয় আর নেই, তবু আইনের যদি থাকেই কোনও খোঁচ-খাঁচ তাহলে একজন ভালো উকিলের রায় নিয়ে এগুনোই ভাল। ওর রয়েছেও যখন সুবিধা।

পরদিনই বেরিয়ে সকালে হাওড়ায় পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ক'রে ওরা বেচারামের মনিবের বাড়ির কাছাকাছি একটা হোটেলে দুসীটের ঘর নিয়ে উঠল। খেয়েদেয়ে দুপুরে খানিকটা আরাম ক'রে রঘু বিকালের দিকে কলেজের দোতলাতেই গিয়ে উপস্থিত হোল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখল বেচারাম পরিচিত লম্বা, বিদ্যুৎবাতি-জ্বালা করিডোরের মাঝামাঝি প্রিন্সিপালের অফিসের সামনে উর্দি চাপরাস প'রে বেঞ্চটায় ব'সে আছে। সঙ্গে আরও দুজন, বোধহয় অন্য ঘরের চাপরাশি, বা কেউ দেখা করতে এসেছে। কয়েক পা এগুতেই চিনল রঘুকে, ভ্রূ কুঁচকে চেয়েও রইল, তবে রঘুও যেমন কোন কথা কইল না, একটু সন্তর্পণেই গেল এগিয়ে, বেচারামও নির্বাক কৌতূহলের দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ওর দিকে। এইভাবে বোঝাপড়াটা হয়ে গেল ওদের মধ্যে। রঘু এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমি বেচারাম শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমায় নামই বেচারাম"—দাঁড়িয়ে উঠে বলল বেচারাম, ভেতরকার উদ্বেগে নিশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠেছে।

রঘু ওর হোটেলটার নাম ক'রে বলল—"আপনার গাঁয়ের এক ভদ্দরলোক আমাদের হোটেলে উঠেছেন, একবার দেখা করতে বলেছেন আপনাকে। কি দরকারী কথা আছে।"

"করব দেখা"—বেচারাম বলল। এরপর সূক্ষ্ম চোখের ইসারায় ওদের দেখা করার সময় আর জায়গাও ঠিক হয়ে গেল। সেই আগের পার্ক, সন্ধ্যার পর, যখন বেচারামের ছুটি থাকে।

রঘুই আগে থাকতে গিয়ে বসেছিল, বেচারাম পৌঁছাতেই প্রথম প্রশ্ন—"একটু বেশি সাবধানই হলাম। তারপর—হুলিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতায় ?..."

বেচারাম বলল—"থাম, কলকাতার তো আর অন্য কাজ নেই! তবু, ভালোই করেছিলি...হঠাৎ দেখে তোর ছদ্মনামটা ভুলে ঐ নাম ধরেই কতকটা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। তারপর, ব্যাপার কি? উকিলের পরামর্শ নেওয়াতে হবে প্রসাদী পিসিকে দিয়ে, একবার দেখেশুনে নোব জায়গাটা—গিয়ে শুনি রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সহদেব চাপরাশি। ভাগ্যিস বাইরে মালীর কাছে খবরটা পেয়ে যাই, নৈলে থানা পুলিসের হাতেই গিয়ে পড়তে হোত।"

'উঠেছিল কোনও গোলমাল ?'--প্রশ্ন করল রঘু।

'তাই দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?.. তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ?...'

"সে অনেক কথা পরে হবে। তার চেয়ে ঢের দরকারী কথা আছে। তুই আগে একটা বিড়ি বের কর দিকিন তোর মার্কামারা, অনেক দিন খাইনি।...উঃ, তোকে দেখে যে কী আনন্দ হচ্ছে রঘু!'

"বুঝলুম।"—পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বের ক'রে ওর হাতে দিতে দিতে বলল বেচারাম। প্রশ্ন করল—'কিন্তু এতদিন ডুব দিয়ে ছিলে কোথায় ?'

রঘু টিপে টিপে একটা বিড়ি ধরিয়ে কৌটা দেশলাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—'বৌকে খুঁজতে।'

'খুন করে?'—একটু গম্ভীর হয়ে পড়েই মন্তব্য করল বেচারাম: বলল—'রাগ করিস তো কি করা যাবে? যে ভাবেই হোক বৌটা গেল তো তোর জন্যেই?'

'তার মানে!'—বিড়িটায় আগুন দিতে গিয়ে থেমে গেল বেচারাম, বলল—"ঠাট্টা রাখ রঘু, সব কথার ঠাট্টা ভালো লাগে না—যদি আবার বিয়ে করে থাকিস—তাও পারিস তুই···"

'আমার ঐটেই ছিল ঠাট্টা। একটা ভোজবাজি দেখালাম···।"

"তার মানে?"

দেশলাইয়ের আগুনটা আঙ্গুল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে কাঠিটা ফেলে দিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল বেচারাম। তাত লেগেছে, দুটো আঙুলের ডগা আস্তে আস্তে ঘসতে লাগল।

রঘু বলল—'ঢাকার মধ্যে ছিলই যে লাস থাকোর—তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? আগাগোড়া ঢাকা—পেসাদী পিসির যে একটা কারচুপি নয়—'আদপে কোন লাসই যে ছিল না ভেতরে—ও-যা মেয়েমানুষ—সবই তো পারে···।"

অনেক দিন পরে পুরনো বন্ধুকে পাওয়া—পেয়েছেও যখন বিপদ অনেকখানি কেটে গেছে—আগেকার মতো ঠাট্টা-মস্করায় মনটা হালকা করে নিচ্ছে রঘু। সেই প্রথম দিন উঠোনে দারোগার সওয়ালের জবাবে যা শুনেছিল গোয়ালঘরের ভেতর থেকে, তার ওপর কল্পনা ফলিয়ে বলতে বলতে ওকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে দেখে হেসে উঠে কাঁধে একটা চড় মারল, বলল—মাথা গুলিয়ে গেছে ছোঁড়ার। তা, সত্যি দেখলে করবি তো বিশ্বাস? চল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

'বৌদিকে? ··মানে, তোর বড়,···মানে, সেই থাকোমণি?···কোথায় আছে?"

'হোটেলেই'—রঘু বলল।

'তা চল যাই···'

উঠতেই যাচ্ছিল, রঘু কাঁধে চাপ দিয়ে বলল—'একটু ধৈর্য ধরতে হবে। প্রমাণ করতে হবে তো সেই থাকোমণিই···'

বেচারাম ঝেড়ে উঠে পড়ল। বেশ রেগেই বলল—'আমায় তাহলে ছেড়েই দে রঘু, হেঁয়ালি ভালো লাগে না। একটা দরকারি কাজের মধ্যে থেকেই

মনিবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি।...হয় তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না হয়...।'

রঘু বসে বসেই ওর হাতে টান দিয়েই আবার বসিয়ে দিল, এবার গম্ভীর হয়েই বলল—'বোস, বোস, শোন সব কথা। শুনেই মাথা খারাপ হয় কিনা ত্থাখ, আমি তো ভুগেও সামলে আছি এখনও।'

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হোল ওদের; ওরই একটানা বলে যাওয়া, বেচারাম রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন।

কালীঘাটে হুটবিহারীকে একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি পিঠের কাছে দেখা থেকে, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘোরা—যাদব দাসের কথায় আতঙ্কে আবার পালানো—ধর্মশালায় হঠাৎ থাকোমণির সঙ্গে দেখা—তারও কথা কিছু কিছু—প্রসাদীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালানো; রঘুর কাছে যাচ্ছে এই বিশ্বাসে—ধর্মশালায় দেখা হওয়ার পর দুজনে দেশে যাওয়ার তোড়জোড়—তারপর নিতান্ত আকস্মিকভাবে আইনের পরিপন্থী কথাটা কানে যেতে বেচারামের কাছে চলে আসা। সব বলে গিয়ে প্রশ্ন করল—'তারপর? —তুই গিয়েছিলি প্রসাদী পিসির কাছে? কি বলে?'

"যাই নি? বললাম না?—ফিরে এসে দেখি..."

—গভীর আগ্রহের সঙ্গে একরকম রুদ্ধশ্বাসেই শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্নে অন্যমনস্ক হয়ে একটু রাগের সঙ্গেই বলে উঠেছে বেচারাম, রঘু বলল—"শুনলে সব, তবু সেই কথা ধরে থাকবে। পালিয়েছিলাম বলেই তো পেলাম থাকোকে, সে কথাটা ধরবে না!"

বেচারাম অপ্রতিভ হয়ে পড়ে একটু হেসে বলল—"সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক।...সে দিন নাকি রাগটা বড় বেশি হয়ে পড়েছিল। প্রসাদীপিসির কথা জিজ্ঞেস করছিলি? সে তো শুনেই লাফিয়ে উঠত। চিঠি পেয়ে আরও খুশী, তবে ওর মতে খিদিরপুরে এসে সলাপরামর্শর দরকার কি? পালিয়েছে, আগে তো সেইধরনের লোক বলেই ধরে নেবে, শেষ পর্যন্ত যখন তোকে এনে ফেলতেই হবে। এর ওপর, যদি ঐ সময় বরাবর কিছু জিনিস খোওয়া গিয়ে থাকে বাড়ি থেকে তো তোকেই টানবে আগে। বড়লোকের বাড়ি, মনিবের খয়ের-খাঁ ছিলি, শত্রু থাকাও আশ্চর্য নয়; অপবাদ দিয়ে দিতে কতক্ষণ?..."

"মাগির মাথা আছে, দেখছিস!"—শুনতে শুনতে প্রসংসায় চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে রঘুর, বলল—"আমাদের ওদিকে খেয়ালই যায় নি। সত্যিই তো ..."

"আর একটা জিনিস যা এই থেকে বেরিয়ে আসছে"—বাধা দিয়ে বলল, বেচারাম—"তা এই যে, ও সত্যিই চায় তুই ভালোয় ভালোয় ফিরে আসিস বাড়ি, কোনও অনিষ্ট না হয় তোর। নয় কি ?"

"মানতে হয় বৈকি। আর একটা কথা ভেবে দেখ রঘু…"

বেচারাম হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল—'পরে হবে। তারপর শোন। আরও একটা দরের কথা প্রসাদীপিসি যা বলছে—একেবারে অত বড় কৌঁসিলের কাছে না গিয়ে তোদের যে জানাশোনা মোক্তার আছে—একরকম বাড়ির মোক্তারই, কৃপাসিন্ধু মল্লিক—ভালো মন্দ কত ফৌজদারি কেস করেছে তোদের জমিদারি নিয়ে—আগে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে—বেশ মন খোলসা করে সব পরামর্শ করবে—বেশ মন খোলসা করে সব কথা বলাও যাবে তাকে—গোড়া থেকে তোকেই এনে ফেলে। কাজ কি অত লুকোচুরির ? এরপর তিনি যদি দরকার বোঝেন, তিনিই ঠিক করে দেবেন কোনও নামকরা কৌঁসিল।'

থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল—'কেমন বুঝছিস ?'

"ভালোই, খুবই ভালো। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস বেচু ?—ভাগ্যিস আগ্রা স্টেশনে কথাগুলো কানে এসে লাগে, একরকম কাকের মুখে বকের মুখেই তো, নইলে সোজা বাড়িই চলে যাচ্ছিলাম ! অবস্থাটা কি দাঁড়াতো ?… যাক সে কথা। তাহলে তুই কবে যাচ্ছিস ? এখন তো আরও ভালো হয়ে গেল। তখন ছিল খুনী আসামী, ফিরে এসে বলছে সে করেনি খুন। প্রমাণ দেওয়া। এখন তো যে খুন হয়েছে বলে গুজব, সে সশরীরে হাজির, অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে না ?'

"তা যাচ্ছে বইকি, তবে…"

"বুঝেছি—তবে খুন হোলটা কে ? তা যদি বলিস তো—আমি তখন ঠাট্টা করে বললাম বটে, কিন্তু সত্যিই কি এমন হতে পারে না যে ঢাকার নীচে লাসটাস কিছুই ছিল না ? সব প্রসাদীপিসির কারচুপি। সেদিন গোয়ালঘর থেকে উঠোনে দারোগার জেরায় শুনলাম কিনা—পুরু কাঁথার ওপর সুজনি দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা—কাউকে মুখ খুলতে দেয়নি প্রসাদীপিসি। আগে অতটা ভাবিনি, এখন সব মিলিয়ে দেখে…"

"একেবারে এতটা !"—অবিশ্বাসের হাসি হাসল বেচারাম। বলল—"তাছাড়া থানা আছে, ময়না তদন্ত আছে, দাহ আছে…"

"যে টাকার জোরে সব ঢাকা পড়ে যায়। আর প্রসাদীপিসি যা ঘোড়েল মেয়ে!..."

প্রশংসার ঝোঁকে অবিশ্বাসের কোটায় উঠে গেছে রঘু। একটু অপ্রতিভের জিদ ধরেই কথাকটা বলে চলল—"থাক, সেসব প্রসাদী আর কৃপাসিন্ধু মল্লিক বুঝবে। আমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? চল রাত হয়ে গেছে। থাকো একলা বসে আছে।"

উঠবে, বেচারাম বসে থেকেই বলল—"তুই যানা, আমায় আবার কেন?" অল্প হাসির সঙ্গে একটু কুণ্ঠা ফুটে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। রঘু থমকে পড়ে প্রশ্ন করল—"আর তুই?"

"হবেই তো দেখা এর পর কোন সময়।"—সেইরকম একটু অপ্রতিভ হাসি নিয়েই বলল বেচারাম।

রঘু একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বলল—"ও! বুঝেছি। তা তোকে এত আকাশে তুলে দিয়েছি থাকোর কাছে যে · নে, ওঠ, আর ন্যাকামি করতে হবে না।"

উঠে পড়ে ওরও হাত ধরে টেনে তুলল। বেচারাম হাসতে হাসতে বলল—"উস্। কী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রে! কাপ্তেনি করে গেছিস, আমি না হয়—কি যে বলে···"

"সেই কথাই বলিস বৌকে, মুখে সরবতের গেলাস ধরবে।"

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল দুজনে।

॥ বত্রিশ ॥

হোটেলে সাক্ষাৎকারটা একটু অস্বস্তিকরই হোল।

পাড়াগাঁয়ের পুরাতনপন্থী সমাজ, তাতে সামন্ত পরিবারের একটা আভিজাত্যও রয়েছে, বন্ধুপত্নী হলেও এবং রঘুর চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট বলে প্রতিবেশী সম্পর্কে দেবর হলেও, থাকোমণির সঙ্গে অবাধ মেলামেশা কখনও ছিল না বেচারামের। নূতন বিবাহের পর যে ক'টা বৎসর ভালোভাবে কেটেছে, ভরা সংসার, তখনও নয়; তারপর যখন রঘুর কাপ্তেনির প্রধান চেলা হিসাবে বদনাম উঠে গেছে বেচারামের, তখন তো আরও নয়, যাওয়া-আসাই বন্ধ হয়ে গেছে ওদের বাড়িতে।

আজ অবশ্য প্রস্তুত ছিল থাকোমণি। রঘুর কাছে ওর নূতন পরিচয় পাওয়ার পর স্নেহ বা প্রীতিমিশ্রিত একটা আগ্রহও লেগেছিল, তবে কোনরকম এতটুকুও উদ্বেগে সেটা প্রকাশ পেল না বা, পারলই না প্রকাশ করতে। পর্দার পেছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, একটা সহজ দেবর-ভাজের ভাবটা বজায় রাখবার জন্যে দুই বন্ধুর প্ল্যানমতো, "বৌদি, আসব?" বলে দরজায় টোকা দিতে এগিয়ে এসে "এসো ভাই" বলে অভ্যর্থনা করল। তবে আধঘোমটা টানা, একবার চোখ তুলে দেখবার পরই দৃষ্টি সন্নত, মুখটাও আরক্তিম হয়ে উঠেছে। একটা টেবিল দুটো চেয়ার ঘরে। ওরা দু'জনে গিয়ে বসল। রঘু ঘরে একটা স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া এনে ফেলবার জন্য ভরা আওয়াজে একটু ব্যঙ্গের টোনেই বেচারামকে টেনে থাকোমণিকে উদ্দেশ করে বলল—"আসতেই চায় না তো। প্রায় টেনেই নিয়ে আসতে হোল, বললাম…"

"ভুলে গেছেন আমাদের বোধহয়।"—থাকোমণিরও বোধহয় সহজভাব ফোটাবার চেষ্টা একটা। তবে ঐ পর্যন্ত। খাবার আনিয়ে রেখেছে, কথাটা বলার সঙ্গে একবার বেচারামের দিকে একটু হাসির সঙ্গে ফিরে চাইবার চেষ্টা করে হেঁটমুখে সেগুলো প্লেটে সাজিয়ে দিতে লাগল। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুদৃশ্য করে গোছাতে গোছাতে। শেষ হলে রঘুকেই প্রশ্ন করল—"চায়ের কথা বলে দেবে, না, অরেঞ্জস্কোয়াশ ঠিক করে দোব? আনিয়ে রেখিছি?"

"ঐ মিলিয়ে নে বেচু, তোকে বললাম না তখন?" স্বচ্ছন্দভাব এনে ফেলবার আর একটা সুযোগ পেয়ে বেচারামের দিকে চেয়ে বলে উঠল রঘু। থাকোমণিকে বলল—"না, সরবতই করে দাও ভালো করে। বেচু বলছিল, কবে তোমার হাতের সরবৎ খেয়েছিল, এখনও জিভে লেগে আছে ওর।"

বেচারামের বিস্মিত চোখের ওপর দৃষ্টি তুলেই কথাটা বলে মন্তব্য করল—"আর চা সে তো বেয়ারায় দিয়ে যাবে। না রে?"

"গরমও তো যাচ্ছে?"—বেচারাম টিকা করল। একটু নজরের শাসানিও হানল।

থাকোমণি হেঁটমুখে সরবৎ প্রস্তুতিতেই নিযুক্ত রেখেছে নিজেকে এদের দিক থেকে খানিকটা পেছন ফিরে, তোয়ের করে "নিন" বলে গেলাসটা টেবিলে বেচারামের দিকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে রঘুকে প্রশ্ন করল—"তোমাকেও দোব করে?"

"তবু ভালো!" বলে রঘু একটা ছোট্ট কামড় দিল। একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—"দাওই না হয়, বেচুর এত প্রশংসাটা কিসের দেখতাম।"

একটু যোগ দিল এতক্ষণে থাকোমণি, ঘাড়টা ঘুরিয়ে বেচারামের দিকেই একটু চেয়ে নিয়ে বলল—"শুনলেন তো?"

বেচারাম বলল—"ওর কথায় কান দেবেন না, ঘরে ঢুকেছে পর্যন্ত নাগাড়ে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে।...দেখুন না, চমৎকার হয়েছে. একটু চাইতাম, তার পথ বন্ধ করে দিলে।"

একটু হাসি ফুটে থাকবে থাকোমণির ঠোঁটে, তবে এবার সেটা আর দেখা গেল না। ঘুরে গেলাস থেকে ওর গেলাসটা ভরে দিয়ে আবার তোয়ের করতে লাগল।

এবার যেন একটু বিলম্বিত লয়ে। হাতটা বার দুই যেন একটু কেঁপে গেল। একবার আঁচল তুলে কপালে ঘাম মুছে চোখের ওপর দিয়েও আঁচলটা টেনে দিল।

দুই বন্ধুতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইল।

সরবৎ শেষ হলে খাবারের প্লেটটা বেচারামের দিক এগিয়ে দিতে রঘু বলে উঠল—"আর আমার? বাঃ"

"এখুনি খেতে দেবে...তাই।"—বলে থাকোমণি একটু চোখ বড় করে বেচারামকে সাক্ষী মানছে, রঘু বড় রাজভোগটা তুলে নিয়ে একটা কামড় দিয়ে বলল—"অত ভাজের আদর খায় না।"

"দ্যাখো! অবাক কাণ্ড!"—বলে একটু হঠাৎই ওদের দিকে পেছন করে অরেঞ্জস্কোয়াশের বোতল, প্লেট, গেলাশ নিয়ে অযথাই নাড়াচাড়া করল থাকোমণি। কোনও রকমে ওদের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখবার চেষ্টা করছে। তবে শেষ পর্যন্ত আর পারল না,-তড়িৎগতিতে কোন-রকমে বিছানা পর্যন্ত গিয়ে যেন মুষড়ে পড়ল বালিসে মুখ গুঁজে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—"কী হবে? এত সুখ যে আমার সয় না—কখনও যে সইল না—ভয় করে আবার কি অমঙ্গল আসছে—কি করি আমি?—বলুন আমায় কি করি?—যখনই একটু সুখের মুখ দেখেছি—কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়!—মা গেলেন—বাবা গেলেন—উঃ।—কি করি আমি?—কী হবে?...

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষে শুধুই কান্নার একটানা সুর—

ফোঁপানিতে ভেঙে ভেঙে যাওয়া—মাঝে মাঝে "উঃ। বাবাগো!—কোথায় যাই?"

দু'জনে হতভম্ব হয়ে বসে আছে, প্লেটটা টেবিলে রাখা। এমন আনন্দের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া ব্যাপারটা, কোনও কথা যোগাচ্ছে না। এক সময় বেচারাম বলল—"বল্ না রঘু, আর তো ভয়ের কিছু রইল না—এখন উনি না বুক বাঁধলে আমরা কোথায় বল পাব? যেটুকু আছে বাকি বাড়ি ফিরে যেতে, কি করে সেটুকু সামলে নেবে?"

নিজেই চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে গেল পাশে। মাথাটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—"শুনাছেন বৌদি? আপনি এমনভাবে, ভেঙে পড়লে রঘু যে দিশেহারাই হয়ে পড়বে আরও। চুপ করুন। আমি কাল গ্রামে যাচ্ছি। এখন শুধু বাকি রইল—কিভাবে গিয়ে উঠতে হবে বাড়িতে। অনেকগুলো ব্যাপার হয়ে গেল সেখানে এই বছর খানেকের মধ্যে তো। তবে ভরসা—কোনটারই গোড়া নেই। আর মাত্র ক'টা দিন একটু ঠিকঠাক করে নিতে, তারপরেই·· না, কাঁদবেন না আপনি আর। চুপ করুন—কথা রাখুন, নৈলে, আমিও ভাবব—ক্ষমা করতে পারেননি ছোটভাইকে। উঠুন লক্ষ্মীটি।"—ওরও কণ্ঠস্বর ভেঙে আসছে।

কান্না থেমেই গিয়েছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্ট দিকে মুখ করে, আধবসা হয়ে উঠে বসল থাকোমণি।

বেচারাম যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছ থেকে আবার ঘুরে এসে দরজায় মুখ গলিয়ে বলল—"রঘু একবার আসবি, কথা আছে একটা।"

নীচেই চলে গেল দুজনে, ফুটপাথে। একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে বেচারাম বলল—"কাল যাচ্ছি না আমি। কথা হচ্ছে, যেমন দেখা যাচ্ছে, তোদের তো এখন বেশ দিনকতক বাইরেই থাকতে হবে। নয় কি?"

"তা হবে বইকি।"—রঘু উত্তর করল, প্রশ্ন করল—"কতদিন আন্দাজ করিস? কি রকম চঞ্চল হয়ে পড়েছে দেখছিস তো?"

"তা বেশ কিছুদিন মনে হয়। যে ক'দিনই হোক, এখানে তো থাকা চলবে না।"

"আমিও তোকে বলব মনে করছিলাম। যদি এ রকম কান্নাকাটি করে..." একটু বিমূঢ় ভাবেই চেয়ে বলল রঘু।

বেচারাম বলল—"সে তো আছেই। দু'জন বেটা-ছেলে, একজন মেয়ে-ছেলে—কান্নাকাটি করছে—হোটেলের ব্যাপার—আমি ঐ জন্যেই একবার বাইরে বেরিয়ে গেলাম—পাশের দুটো দোরেই তালা ঝোলানো, তবে খোলা থাকতেই বা বাধা কি? সন্দেহ হলেই হাঙ্গাম তো, কলকাতা জায়গা।"

বিমূঢ় ভাবেই চেয়ে রইল রঘু। যেন এতটা তলিয়ে ভাবেনি। বেচারাম বলে চলল—"আর একটা কথা বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস থাকোকে পেয়ে।"

"কি?"

"তোর মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়াটা এখনও রয়েছে। নিজে হতে আত্মসমর্পণ করা পুলিসের হাতে, আর ফেরারী বলে কারুর ধরিয়ে দেওয়া, দুটোর মধ্যে ঢের তফাৎ। সব প্ল্যান উলটে যাবে আমাদের।"

"তাহলে?" সত্যিই থাকো আর তোকে পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্দি আছি, অস্বীকার করতে পারি না একথা। বিশেষ করে তোকে পেয়ে,—একজন নিজের মতন করে ভাববার লোক।"

—চিন্তিত ভাবেই চেয়ে থেকে বলল রঘু।

"অবিশ্যি চিন্তার অনেক কিছুই কমেছে একথাও ঠিক, তবে সাবধানে থাকতে হবে বৈকি; হোটেল ছেড়ে দিতে হবে আর একটা কারণে। সেইটেই সব চেয়ে বড় কথাও। কৃপাসিন্ধু মোক্তার যে মকদ্দমার মহলা দেবে সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে, সে তো এখানে একেবারেই হতে পারেনা। কাকে কিভাবে তালিম দিতে হবে, তোরা ছাড়া আরও কাদের দাঁড় করাতে হবে—তার মধ্যে প্রসাদী পিসি আর ভৈরব তো আছেই। কৃপা মোক্তার টাকা খাইয়ে সরকারী পক্ষের অনেককেও টেনে নিতে পারে কিছু কিছু করে—যেমন ধরো রহমৎ শেখ চৌকিদার। আরও যদি কিছু সাক্ষী দাঁড় করতে হয় কৃপা মোক্তার বুঝবে তা। এখন তোদের বাড়ীতে বা মোক্তারের নিজের বাড়ীতে এসব তো হবে না ··"

"কি করে হবে?"—সায় দিল রঘু, অবোধের মতোই চেয়ে থেকে।

"তাই বলছিলাম, একটা বাসা ঠিক করতে হবে মাস খানেকের ভাড়া দিয়ে। কাল আর গ্রামে গেলাম না আমি। একটা নিরিবিলি দেখে বাড়ি খুঁজে বের করি। একদিনে না হয় ছুটি নিয়ে আরও দু এক দিন যা লাগে। ঠিক করে তারপর গ্রামে যাওয়া, প্রসাদী পিসি আর কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে দেখা করা।"

"তাই কর তবে। হাঁ, সেই ঠিক হবে।· কিছু তোর হাতে দিয়ে রাখছি। আগাম চাইবে তো বাড়িওলা।"

"হাঁ, সে কথাও তো তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আছে কত তোর কাছে আর ?"

একটু গম্ভীর হয়েই বলল—"থাকোঅরেঞ্জকোয়াস আর মিষ্টিতে অন্তত দশটা টাকা খরচ করেছে। তাকে অবিশ্যি বলবি নি, তবে আমার খুব ভালো লাগেনি রঘু।"

রঘু বলল—"আছে হাতে কিছু। এ কটা মাসে তো এক রকম কিছুই খরচ হয়নি আমার, শুধু থাকোর আসার পর যা একটু···"

অপ্রতিভ ভাবে চাইল।

"তবু ?···ওদিকে ক' মাসের মাইনেই তো ?"

হ্যাঁ "তাই, শুধু, দুটো গয়না—আমার কাছে যা ছিল—ক্ষীরোদা দেয়··· ।'

"ঐ পর্যন্তই থাক।"—একটু হুকুমের টোনেই বলল বেচারাম। হাতটা বাড়িয়ে বলল—"আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর রঘু, থাকোর গয়নায় আর হাত দিবিনি।"

"দিই নি বেচু। আর দোবও না। এই শপথ করছি। কিন্তু···"

চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

বেচারাম বেপরোয়া ভাবেই বলল—"আর কিন্তু কি ? এবার থেকে তো প্রসাদী পিসি। সে সরকারী লোক ওর মুঠোর মধ্যে। অনেক গুছিয়েও নিয়েছে পিসি,·· তাছাড়া, আমিও তো সামলে নিয়েছি ?

ওর পিঠে দুটো লঘু আঘাত দিয়ে, একটু রসিকতা করে হেসে বলল—"গোড়ায় কিছু দিন অবিশ্যি কাপ্তেনহারা হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ি।·· যা, থাকো আবার কি ভাবছে। একটা কিছু বানিয়ে বলবি তাকে। আর একটা কথা রঘু, ওকে একা ফেলে বাইরে যাবিনি কখনও।"

আর একটু রসিকতা করে বলল—"বরং যদি সেজে-গুজে দু'জনে একটু-আধটু হাওয়া খেতে বেরুস ট্যাক্সিতে রিক্সায়, রাজি আছি। যা।"

দু' পা এগিয়েই আবার ঘুরে, এবার গম্ভীর ভাবেই বলল—"নারে, ইয়ারকি নয়, সত্যিই তাই করবি। তাতে, পাঁচটা জিনিস দেখে শুনে ওর মনটাও এদিক থেকে ঘুরে যাবে। যা, চললাম আমি।"

প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গেল পছন্দমতো বাসা পেতে, তবে শেষ পর্যন্ত

পেল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের শেষে সার্কুলার রোডের কাছাকাছি একটা গলিতে একটা তেতলা ফ্ল্যাট বাড়ি, তার একেবারে তেতলায় দুখানা ঘর। রান্নাঘর বাথরুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবই আছে। একটা বিশেষ সুবিধা, ফ্ল্যাটের বাড়ি যেমন পাশাপাশি দুটো করে থাকে, এ সে রকম নয়। তেতলায় ঐ একটি ফ্ল্যাট, সামনে খোলা ছাত খানিকটা। ফ্ল্যাটই তোয়ের করতে গিয়ে কোন কারণে ছেড়ে দেওয়া, বা স্থগিত রাখা। আদলটা রয়েছে।

ঠিক যেমনটি দরকার ও'দের। বাড়ির অন্য অংশের সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই। শুক্রবার দিন হোটেল ছেড়ে উঠে এল ওরা। দুটো দিন গোছগাছ করে নিতে লাগল। ছোটখাট সংসারই একটা। ছুটি এদিকে আর নেয়নি বেচারাম, অবসর সময়েই ঘুরে ঘুরে ঠিক করেছে বাসাটা; কয়েকজনকে বলেও রেখেছিল। রবিবারের সঙ্গে আরও দুটো দিন ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেল।

ছুটি কাটিয়ে যখন ফিরল, মঙ্গলবার বিকালে, ওর সঙ্গে প্রসাদী। বুকে এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়েই খুব একচোট কাঁদল থাকোমণি নীরবে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, "চুপ কর, চুপ কর"—বলে প্রসাদী পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আঁচল তুলে নিজের চোখ মুছছে।

অনেকক্ষণ গেল। উচ্ছ্বাসটা কমে এলে বলল—"চুপ কর।...চল, কি রকম ব্যবস্থা করলি দেখি, বাড়িটা তো বেশ পেয়েছিস।" চারজনে মিলে ঘুরে ঘুরে দেখল, ভেতর-বার। অনেকটা যেন থাকোর মনটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেও। গোছানো বিশেষ করে হেঁসেল, ভাঁড়ারের ব্যবস্থা নিয়ে একটু-আধটু শুধরেও দিল, বলল—"এটা এইরকম হবে। কখনও তো করতে হোল না নিজের হাতে। এবার কিন্তু সেখানে আমার ছুটি থাকো, এখন থেকেই বলে রাখছি।"

ওদের দুজনকেও টেনে, ওদের মুখের দিকে চেয়ে—"আর কেন, বলো? নিজের সংসার নেবে না বুঝে?"

বেচারাম বলল—"বুঝে নেওয়ার মতন বুদ্ধি তো ঐ দেখছেন, দুটো ঘরেই এত খুঁৎ।"

একটু হাসি উঠল।

॥ তেত্রিশ ॥

সেই দিনই সন্ধ্যায় কৃপাসিন্ধু মোক্তারও এলেন।

প্রথম সাক্ষাতের আবেগটা কমে এসেছে, বেচারামের ঠাট্টায় হাসিটুকু ছলকে উঠে ঘরের বাতাসটা হালকা হয়ে ঐ সুরেই কথা চলছে, খটখট খটখট করে বন্ধ দরজায় দ্রুত ঘা পড়ল।

কড়া তাগিদের ঘা। বাতাসটা মুহূর্তেই পালটে গিয়েই ঘরটা সঙ্গে সঙ্গেই থমথমে হয়ে উঠল। সবারই চোখে একটু ত্রস্ত দৃষ্টিবিনিময়, বেচারাম প্রশ্ন করল—"কে?"

আরও কড়া খটখট আওয়াজের সঙ্গে ভারি গলা মিলিয়ে হুকুমের আওয়াজ—"দরওয়াজা খোলো।"

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল সবার। প্রসাদীর ভ্রূ দুটো হঠাৎ একটু কুঁচকে গেল তারই মধ্যে, "বুঝেছি।" বলে দ্বিধাছলে গটগট ক'রে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে বলল—"আসুন।·· মাথার ওপর এমন একটা মামলা, মোক্তার দাদার তবু ঠাট্টা গেল না।"

একটা ভালো আরাম কেদারা পাতাই ছিল, বলল—"বসুন। সোজা কাছারি থেকেই তো?"

"আর কোন চুলোয় জায়গা আছে?"

বসতে বসতে কথাটা বলে একবার বিস্মিতভাবে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে এসে বললেন—"কিন্তু আমি বলছিলাম, মামলা কোথায় যে সবাই কালপেঁচার মত মুখ করে বসে আছ···তা বলে তোমায় বলছি না মা থাকোমণি, তুমি গা পেতে নেবে না—শুনলাম তো, তা মামলা কোথায়? যেটুকু বা আছে, কৃপা মোক্তার এই রকম হাতের তেলোয় রেখে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে।" ডান হাতের চেটোটা চিত করে একটা ফুঁ দিয়ে বললেন—"আমার গড়গড়া কোথায়? প্রদাস নিশ্চয় ভুলে গেছ?"

"ভুললে রক্ষে আছে?···যা তো মা থাকো, সেজেটেজেই নিয়ে আসবি একেবারে।···ভুলি? তবে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

"মোকদ্দমার কিছু নেই, তবু তোমরা ভয় পাবে, বাইরে মোক্তার, তার

কৃপাসিন্ধুই, তবু তোমরা কে-না-কে ভেবে ভয়ে সারা। এ ভয়ের ওষুধ কি? তারপর, রঘু, হঠাৎ কি মনে করে?"

সবাই হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল, রঘু উঠে গিয়ে পায়ের ধূলা নিয়ে বলল "চরণে ঠাঁই পেতে কাকা..."

গলাটা ধরে এসেছে। "হয়েছে, হয়েছে"—বলে মাথায় হাত দিলেন কৃপাসিন্ধু। বেচারামও পায়ের ধূলা নিল, প্রসাদীও। গড়গড়া ঠিক করাই ছিল, কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে থাকোমণি এসে পাশে রেখে গলায় আঁচল দিয়ে গড় করল।

মহকুমার নামকরা মোক্তার কৃপাসিন্ধু। জেলার অন্য মহকুমাতেও যাতায়াত আছে মাঝে মাঝে কোর্ট পর্যন্ত। পুরনো, ঘাঘি মোক্তার, মোকদ্দমা সাজাতে বিচক্ষণ, তবে সাজানোর মধ্যে আইনের মার-প্যাঁচের চেয়ে প্রতিপক্ষকে "হাত করাতেই" কৃতিত্ব বেশি কৃপাসিন্ধুর। এ বিষয়ে কি রহস্যময় উপায়ে কত উঁচুতে পর্যন্ত যে উঠতে পারেন তার সীমা বাঁধা নেই। প্রতিপক্ষ বলতে অবশ্যমূল বাদী বা ফরিয়াদীই নয়, তার তো নিজেরই মোকদ্দমা, তবে মোকদ্দমার চালচিত্রে সেই তো একা নয়।

মক্কেলদের কাছে মোকদ্দমার পরিভাষায় চলতি 'চালচিত্র' কথাটা ব্যবহার করতে ভালও বাসেন কৃপাসিন্ধু। দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের অর্ধবৃত্ত ধরে যখন হাতটা ঘুরিয়ে আনেন, বেশ একটি মোহনীয় ছবিই ফুটে ওঠে মক্কেলের মানসদৃষ্টির সামনে।

বয়স হয়েছে, রঘুর বাপ হলধরের প্রায় সমবয়সী, বছর তিনেক কমের দিকে। সামন্ত পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। ওঁর যা পেশা তাই নিয়েই শুরু, তারপর সেটা বেড়ে যায়। দুটো কারণে, বয়সের দিক, যার জন্যে প্রয়োজনের পরিচয়টা একরকম বন্ধুত্বেই গিয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া গোটা তিনেক গ্রাম পেরিয়ে কৃপাসিন্ধুর বাড়িও, যার জন্যে সুবিধা আর অবসর পেলেই যাতায়াতের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানেরও একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গতিবিধি বৈঠকখানা থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত। গেলেই কলকে-মাথায় গড়গড়াটি এসে পড়ে। বৈঠকখানা হলে মোকদ্দমার 'চালচিত্র সাজার' মধ্যে। ভেতরে হলে সবার সঙ্গে লঘু আলাপ-আলোচনা, হাসি-মস্করায়। ভেতরের এই ঘনিষ্ঠতার সুবাদে কৃপাসিন্ধু রঘুর মা হয়কালীর দেবর, রঘু আর থাকোমণির

কাকা। থাকোমণির পিসি হিসাবে প্রসাদীর ওপর হাসিঠাট্টার ঝাপটা একটু বেশি করেই এসে পড়ত, যেখানে হলধরের ছিল কচিৎ-কখনও।

মানুষটা একটু রঙ্গপ্রিয়। যেমন হোটেলে প্রবেশ করার ব্যাপারে দেখা গেল। কথাবার্তার মধ্যে গুরুতর মোকদ্দমাও হালকা করে ফেলবার বেশ একটা ক্ষমতা আছে।

হলধরের মৃত্যুর পর সামন্তবাড়ির সঙ্গে কৃপাসিন্ধুর সম্বন্ধটা নানা কারণে শিথিল হয়ে পড়ে। বন্ধু হিসাবে হলধর নিজেই নেই। জোতজমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার কাজ অনেক কম, যেটুকু দরকার হোল প্রসাদী নিজেই গিয়ে ওঁকে জানিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করল, তাছাড়া রঘু নেই, তার সে-ধরনের উৎপাতও নেই আর যার জন্যেই ঘুষঘাষ দিয়ে আইনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনটা এসে পড়ে। থাকোমণির আত্মহত্যা, রঘুর অন্তর্ধান, বিষয়সম্পত্তি কোর্টের হেফাজতে—এই সব বিশৃঙ্খলার জন্যে মনটাও একেবারে উঠে গিয়েছিল সামন্তবাড়ি থেকে, বেচারাম আর প্রসাদীর মুখে সব শুনে আবার এসেছেন।

সোজা কোর্ট থেকে ট্রেনে শিয়ালদায় নেমে। গড়াগড়া টানার মধ্যে লঘু আলাপ-আলোচনায় পরিবেশটা আরও সহজ করে এনে, মুখহাত ধুয়ে চা-জলযোগ সারলেন কৃপাসিন্ধু। আলাপ-আলোচনা চলছে এটা সেটা নিয়ে, যা সামনে এসে পড়ছে, আজকের কাছারি-করা থেকে বর্তমান জিনিস-পত্রের দুর্মূল্যতা পর্যন্ত।

ঐ প্রসঙ্গের মধ্যেই একবার একটা রাজভোগ তুলে থেমে গিয়ে রঘুর দিকে চেয়ে বললেন—"ভয় নেই, মোকদ্দমা সাজিয়ে দোব একেবারে চালচিত্রের মতন করে। বেশ পকেট ভরে দিবি-থুবি কিন্তু রঘু। দাদা যাওয়ার পর আর ওদিক থেকে আমদানি হয়নি তোর কল্যাণে।...উঃ, কি ধাউণ্ডুলেই হয়ে উঠেছিল, না গো প্রসাদ? সে কি সামলাতে পারা যায়। বাব্বা!"

একটা কামড় দিয়ে বললেন—'তা এ-ও বলতে হয়, বড় মানুষের ছেলে বাউণ্ডুলে না হলে আমাদের মোক্তারের গুষ্টি বাঁচি কি করে? নয় কি?"

"ক্ষামা দিন দাদা! আর মোক্তারের গুষ্টি বাঁচাবার জন্যে বাউণ্ডুলে হয়ে কাজ নেই! ঢের হয়েছে।"

এমনভাবে শিউরে উঠে বলল প্রসাদী যে, সবাই বেশ সজোরেই হেসে উঠল। কৃপাসিন্ধু পর্যন্ত। প্রসাদী তারই মধ্যে বলে চলল—"আর পকেট ভরে

দেওয়া? একটা কানাকড়ি দিয়েও নয়। কী রেখেছেন সামন্তবাড়ির আর উকিল-মোক্তারে মিলে? ফোঁপরা হয়ে রয়েছে।"

হাসিটা আবার একঝোঁক উছলে উঠল। "দেখেছ? দেখেছ?"—বলে তোয়ালেয় হাত মুখ মুছতে মুছতে পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে আরাম চেয়ারে বসলেন কৃপাসিন্ধু। গম্ভীর হয়েই বললেন—"নাও, এবার কাজের কথায় এস তো। সব শুনেছি প্রসাদের মুখে, এবার তোমাদের মুখে একবার শুনে নেওয়া দরকার। কিছু কিছু সওয়ালও থাকবে। রঘুর আগে বলো। গোয়াল ঘর থেকে যতটা পারলে দেখে শুনে নিয়ে গেলে, তারপর?"

থাকোমণি এসে পালটে নূতন ক'রে সাজা কলকেটা গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে পাশের ছোট টেবিলটায় ডিবেয় ক'রে পান আর জরদা রেখে দিল। আগে কৃপাসিন্ধু সামন্তবাড়িতে এলে এটা ওরই কাজ ছিল। কৃপাসিন্ধু ঘুরে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন—"এই তো মার আমার মনে আছে। আর সবাই বেইমানি করে তো মা আছে আমার। লক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হয়ে ফিরে এসেছে। নাও, সুরু করো রঘু।"

সবার প্রসন্ন স্মিত হাস্যের মধ্যে রঘু আরম্ভ করল।

॥ চৌত্রিশ ॥

দিন দশেক লাগল কৃপাসিন্ধুর সব গোছ্গাছ করে নিতে। মোকদ্দমার মধ্যে সত্যই কিছু নেই। যার খুন হওয়া নিয়ে মোকদ্দমা সে সুস্থ শরীরে হাজির। খুনী তাকেই সাবুত রেখে আত্মসমর্পণ করছে। ও ধারটা একেবারেই পরিস্কার, শুধু আইনের কতকগুলো বিধিবদ্ধ পদ্ধতি পালন করে যাওয়া। হয়তো প্রমাণ করতে হবে যে এই মানুষটাই থাকোমণি, সুতরাং খুন হয়নি। প্রতিপক্ষ অবশ্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে, এ থাকো সে থাকো নয়। তার খুন হওয়াটাই সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করবে। তার জন্য স্বামীস্ত্রীর প্রকৃত কটু সম্বন্ধটা প্রকাশ্যে আনবার চেষ্টা করবে একেবারে ক্ষীরোদাকে পর্যন্ত টেনে। এইগুলোই কাটিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আসামী থাকোমণি আর প্রসাদীর জবানবন্দীতে রঘুর উচ্ছৃঙ্খলতার কথার যাতে একেবারে কোনও ইঙ্গিত মাত্র না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাক্ষীদের কথাতেও এ নিয়ে প্রতিপক্ষের কোনও প্রশ্ন থাকলে অস্বীকার করে যাওয়া। এই হল মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার এক অংশ বলাই ঠিক। কেননা এ মোকদ্দমার আর একটা অংশ আছে, খুন হয়নি তো লাস কোথা থেকে এল? প্রসাদীর অভিপ্রায়টা কি ছিল এই মিথ্যাচারের?

আসলে এ একটা আলাদা কেসই। এটা শেষ হবার পরও এই নিয়ে পড়তে পারে প্রতিপক্ষ, যেহেতু প্রতিপক্ষ এখানে স্বয়ং সরকার। তবে যদি এইখানেই প্রসাদীর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায় তো তার সম্ভাবনা অল্পই থাকে।

এইগুলো ঠিক করে, নেওয়া, গোপনে গোপনে। তারপর রঘুর এমনভাবে আত্মসমর্পণ করা যাতে তার হাজতের মেয়াদটা যতটা সম্ভব অল্পস্থায়ী হয়, অর্থাৎ মোকদ্দমাটা ধাপে ধাপে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে তাড়াতাড়ি রায় বেরিয়ে সে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেতে পারে।

হাজতে থাকার কটা দিনও যাতে তার কোনও অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করা; টাকা ঢেলে যথাস্থানে।

থানা থেকে নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত খুব ঘোরাঘুরি চলল কদিন ধরে কৃপাসিন্ধুর। ভালো উকিল ঠিক করা। সাক্ষী-সাবুদ ঠিক করা। সাক্ষীর মধ্যে গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বর রইল, যারা সেদিন সকালের ঘটনাটা দেখেছে। তাছাড়া এদিকের সরকার পক্ষের সাক্ষী তো রয়েছেই, রহমৎ শেখ থেকে নিয়ে উঁচুতে পর্যন্ত। টাকা জলের মতো খরচ ক'রে গেল প্রসাদী। ওদিকের গুলাকে হাত করতে তো লাগলই, তা ভিন্ন নিজের দিকেও সবাইকে খুশী করে রাখতে হোল। সত্য কথাও কলিযুগে একটা পণ্য, না কিনলে পাওয়া যায় না। যে পুরুত বিবাহ দিয়েছিল, তারপর সামন্তবাড়িতে বরাবর এসে পূজা-পার্বণে পৌরোহিত্য করে গেছে থাকোমণির আয়োজনেই সেও বলল—চিনি বৈকি, তবে নাকি বড় জটিল ব্যাপারে, মাথা গুলিয়ে কি বলতে কি বলে ফেলব, তার চেয়ে বাদই দেও না হয় আমায়।"

বড় সাক্ষীই এক হিসাবে। বুদ্ধির জট খুলে রাখবার জন্যে বেশ ভালো করেই তৈল নিষিক্ত করতে হোল তার মাথাটা।

মোকদ্দমার ভাগাড়ে মড়া পড়লে সব পাখিই শকুনি হয়ে উঠে। একটা খুব বড় সম্ভাব্য সাক্ষী ক্ষীরোদা তার সঙ্গে বামনদাসও। প্রতিপক্ষ চাইবেই তাদের টানতে। বামনদাস জানিয়ে দিল, তাদের যখন আর ভয়ের কিছু নেই তখন তারা পাকিস্থান থেকে বাধআঁচড়াতেই আবার ফিরে আসছে। তাদের

অন্তত মামলা শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত টাকার মন্ত্রপূত গণ্ডী দিয়ে আটকে রাখতে হোল। এপারে এলে তাদের আলাদা ব্যবস্থা করতে পারতেন কৃপা-সিন্ধু, তবে আর ভেজাল বাড়াতে চাইলেন না।

এর পর মাঝে মাঝে উকিলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশমতো আমহার্স্ট স্ট্রীট লগ্ন ফ্ল্যাটে এসে সবাইকে তালিম দেওয়া পালা করে সাক্ষীদের আনিয়ে। দু দিন উকিল নিজেও এলেন। বেরুবার তো উপায় নেই কারুর। মাথার ওপর হুলিয়া, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেয়ে গেলে সমস্ত কেসটা যাবে উল্টে, আইনের নজরে ধরা দেওয়া আর ধরা পড়ায় বিস্তর প্রভেদ।

কৃপাসিন্ধু তাঁর প্র্যাকটিসের স্থল মহকুমা কাছারী থেকে বা উকিলের কাছ থেকে, অথবা অন্য কোনও জায়গায় প্রয়োজন মতো জমি ঠিক করে সন্ধ্যার পর ফ্ল্যাটে চলে আসেন, তালিম দেন। মূল সওয়াল জবাব যেভাবে এগুতে পারে, তার পর ক্রস—যাতে বৈষম্য এসে পড়ে কেস নষ্ট না হয়।

এ মামলায় আর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। হুলিয়ার টাকাটার লোভ, আত্ম-প্রকাশের আগেই ফাঁস করে দিয়ে টাকাটা বের করে নেওয়া। এর জন্য নিজেদের দিকের সাক্ষী নির্বাচনে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হোল। গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে যারা এ-ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাদেরই তালিকাভুক্ত করা হোল। একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রইল—মামলায় যখন কিছু নেই বেরিয়ে আসবেই রঘু, তখন, আনুকূল্যের জন্য যেমন তার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, প্রতিকূলতা করতে গেলে তেমনি উগ্র প্রতিহিংসারও সম্মুখীন হতে হবে এ-ধরনের দাগাবাজকে। সবাই কৃপাসিন্ধু মোক্তারকে চেনে, প্রসাদীকে চেনে, রঘুরও পূর্বের রূপটাই জানে; গ্রামের মধ্যে থেকে সাহস করবে না। তবু থানার দিকটাও ঠিক রাখতে হল। গোপন সংবাদ তো সেখানেই পৌঁছাবে আগে। পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে গ্রেপ্তারের আগে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থাটা হয়ে যায়।

মামলায় বিশেষ কিছু না থাক, 'চালচিত্র' রচনায় যথেষ্টই কারুকৌশল অবলম্বন করতে হোল কৃপাসিন্ধুকে। গোড়াতেই বলা হয়েছে, আইনের মার-প্যাঁচের চেয়ে এদিকেই তার দক্ষতা বেশী। বড় বড় মামলায় এদিকটা সামলাতেই তাঁর ডাক বেশী করে।

এর পর আত্মসমর্পণের পর কৃপাসিন্ধু যা অঘটনটা ঘটালেন, তাতে সেটা এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্বের একেবারে পরাকাষ্ঠা। আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে

কঠিন অসুখের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের ডাক্তারি সার্টিফিকেট নিয়ে রঘুর জামীনেরও ব্যবস্থা করে সেদিক দিয়েও ওকে মুক্ত করে রাখা হোল।

খুব ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করেও থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে দশটা দিন লেগেই গেল রঘুর। এর পর থানা থেকে নিয়ে আইনসঙ্গত বিধিবিধানের পথ বেয়ে মামলা কোর্টে পৌঁছাতে সপ্তাহ তিনেক লেগে গেল।

কোর্টে তিলধারণের স্থান নেই।

খুনের মামলা তার ওপর সাধারণ খুন নয়তো, স্বামী নিজের পরিবারকে খুন করে ফেরার হয়েছিল, আত্মসমর্পণ করেছে। যেমন খুনের কারণ নিয়ে গবেষণা চলেছে কৌতূহলীদের মধ্যে—নগদ-গহনা পাবার লোভ, স্ত্রীর চরিত্রদোষ, ইত্যাদি, তেমনি কিভাবে খুন করা, তা নিয়েও। এর ওপর লাসের রহস্য নিয়ে একটা আলাদা গবেষণা আছে। কারুর কারুর মতে ওটা স্ত্রীরই লাস, কারুর মতে খুনী, অর্থাৎ স্বামী সে-লাস পাচার করে অন্য লাস টাঙিয়ে রেখে যায়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। এর মধ্যে প্রসাদী-নাম্নী একটা জাঁদরেল স্ত্রীলোকের কারচুপি ছিল—এখন আসামী অন্য এক কাকে এনে বলছে, খুন করিনি, এই আমার স্ত্রী, প্রসাদী সাক্ষ্য দেবে। সে এক বিকটদর্শন ধড়িবাজ স্ত্রীলোক, পাকিস্থান থেকে এখান পর্যন্ত অনেক খেলা খেলেছে।

এমন কথাও তুলছে অনেকে যে প্রসাদী বলে স্ত্রীলোকটা, যে সমস্ত নাটের গুরু, সে নাকি পিশাচসিদ্ধ। আসলে লাস বলে কোন বস্তুই ছিল না ঢাকার মধ্যে, ভূতপ্রেত নিয়েই প্রসাদীর একটা ভেল্কিবাজি।

উদ্দেশ্যটা কি ?

না, এইসব ডাইন যোগিনীদের উদ্দেশ্য যদি টের পাওয়াই গেল তো তারা ডাইন-যোগিনী কিসের ?

এতটা এগিয়ে যাওয়ারও লোক রয়েছে, যত অল্পই হোক।

খুনী আর খুন-হওয়ারও ওপরে প্রসাদীকে ঘিরে কৌতূহলটা জমাট বেঁধে ওঠায় মমলাটা আরও রহস্যময় হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকের কাছে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

এজলাস সাজানো হয়ে গেছে, বিচারকের আসতে যা দেরী। এক সময় তিনি পাশের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে ডায়াসে উঠে আসন গ্রহণ করলেন। দর্শকমহলে যে একটা গুঞ্জন চলছিল, খানিকটা চেপে গিয়ে, ঘরটা থমথমে হয়ে উঠল। নীচের সারে যাঁরা সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, উকিল-মোক্তারের দল, সংশ্লিষ্ট-অসংশ্লিষ্ট, আবার নিজের নিজের স্থানে বসে পড়লেন। কৃপাসিন্ধুও রয়েছেন। পেসকার উঠে কতকগুলো কাগজে দস্তখৎ নিলেন। কেস-ফাইল সামনে রাখা, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে 'কোর্ট' দৃষ্টি সামনে তুলে বললেন—"Yes"?

—পাবলিক প্রসিকিউটার, অর্থাৎ সরকারী উকিলকে লক্ষ্য করে। তিনি উঠে প্রস্তুতই ছিলেন, মামলার বিবরণ শুরু ক'রে দিলেন। এই গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যেটুকু বা গুঞ্জন ছিল, তীব্র উৎকণ্ঠায় সেটুকুও মিলিয়ে গিয়ে একটা নিটোল স্তব্ধতা এসে পড়ল ঘরটার মধ্যে। সরকারী উকিল শুরু করলেন—অমুক তারিখে অমুক গ্রামে অমুক সামন্তের বাড়ী থেকে থানায় একটা ছৈ-ওলা গাড়িতে গ্রামের চৌকিদার রহমৎ শেখের তত্ত্বাবধানে একটি স্ত্রীলোকের লাস এসে পড়ে, গাড়ি হাঁকিয়ে এনেছে বাড়ীর ভৃত্য ভৈরব পাল। লাস আপাদ-মস্তক ঢাকা, মৃত্যুর কারণ বলা হয় গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যা। ঢাকা অপসারণ করাতে, গায়ের মুখের নানা স্থানে ক্ষতচিহ্ন দেখে, বিশেষ করে কাঁধের নীচে একটা চাপা গভীর দাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় কেসটা নিছক আত্মহত্যা নয়, পরন্তু ভোঁতা কোনও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু ঘটিয়ে, গলা টিপে ঘরের কড়িকাঠে টাঙিয়ে রাখা হয়।

লাস যথারীতি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দিয়ে থানার দারোগা সেই দিনই বিকালে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করে দেন। আসামী সেদিন, ও ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণ অনুযায়ী, কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাড়ি ছিল না।

এর পর তদন্তের ফল, ময়না তদন্তের ফল, ঘটনা-নির্দিষ্ট অনিবার্য সংশয়ে মৃতের স্বামী রঘু সামন্তের নামে হুলিয়া পর্যন্ত—দীর্ঘ বিবরণ শেষ করে সরকারী উকিল বললেন, ফেরারী আসামী অমুক তারিখে অমুক সময় হঠাৎ থানায় উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তার বক্তব্য এবং দাবী সে আদৌ খুন

করে নি তার স্ত্রীকে, স্ত্রী গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যাও করে নি, আসামী ঘটনাচক্রে সন্দেহের ভাগী হয়ে আত্মগোপন করেছিল। প্রায় বৎসর খানেক পরে নিতান্ত দৈবযোগেই তার জীবিতা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

বিবরণ শেষ হওয়ার পর যথারীতি একে একে দারোগা, রহমৎ প্রভৃতি সরকারী পক্ষের সাক্ষীর এজাহার নেওয়া হল। প্রতি-পক্ষের জেরাও হয়ে গেল। বাকি রইল প্রসাদী, মূলত যার অভিযোগে সরকারী পক্ষে মামলা রুজু হয়, সুতরাং যে একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

প্রসাদীর ডাক পড়ল।

সমস্ত কোর্ট-ঘরটা আবার নতুন করে সজাগ হয়ে উঠল। খুনের কৌতূহলটা তরল হয়ে গিয়ে সবার উত্তেজনাটা লাস-রহস্যে এসে জড়ো হয়েছে, এর চাবিকাঠি প্রসাদীর হাতে। তার অলৌকিক শক্তি আর আকার-প্রকার সম্বন্ধে আরও গুজব একত্র হয়ে দর্শকেরা আরও যেন কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

সিধে চালে এসে নিঃসংকোচ পদক্ষেপে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল প্রসাদী খাড়া হয়ে। ধপধপে থান কাপড়, ওসারে একটু খাটো বলে পায়ের গোছের কাছে খানিকটা খালি। একটু চোয়াল-উঁচু কঠিন মুখের বেড়, খাঁড়ার মত নাক। কোটরের মধ্যে চোখ দুটো জ্বলছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা পুরুষালি ভঙ্গি। লাস-রহস্য আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সবার কাছে। ভুতুড়ে কাণ্ডর বিশ্বাসটা আবার জেগে উঠল কারুর কারুর মনে।

প্রসাদীর এজাহার জমে উঠল আরও কয়েকটা কারণে, যার জন্যে ওর ব্যক্তিত্বটাও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো সব দিক দিয়ে। একে তার এই পুরুষ, কতকটা চ্যালেঞ্জের ভাব, তার ওপর—আইনের দৃষ্টিতে যাই হোক, কার্যত বিপক্ষে বলেই সরকারী উকিল সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠে মন-মেজাজ ঠিক নেই। একটু জটিলতা এসে পড়ল অন্য কারণেও। প্রসাদীর মূল অভিযোগই সরকারী মামলার ভিত্তি হলেও, রঘু-খাকোমণির আসার পর তার থানায় এজাহার বস্তুত সরকারী মামলার ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছে, যাতে, বলতে গেলে সে এখন কার্যত বিপক্ষেরই, অর্থাৎ আসামী পক্ষেরই সাক্ষী। তার ভাবগতিকও সেইরূপ। সুতরাং তার এজাহারে তাকে যে বিশেষ সতর্কভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একথা কোর্টকে জানিয়েই অগ্রসর হলেন সরকারী উকিল।

একটু ভুলও করে বসলেন।

আর সবার এজাহারের পর একটু বিশ্রামের জন্যই হোক বা নিজের সহকারীকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্যই হোক, তাঁকেই তুলে দিলেন প্রসাদীর এজাহার নিতে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন জুনিয়র এডভোকেট। কৃত্রিম বা স্বভাবসিদ্ধ যাই হোক, উদীয়মান আইনজীবীর একটা স্টাইল আছে—হয়তো পদগৌরবের জন্য একটু বেশই—একটা চনমনে ভাব। চোখে কালো-ফিতে বাঁধা 'পেঁসনে' চশমা। সেটা মাঝে মাঝে ডান হাতে নামিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় নাচাবার একটা অভ্যাস আছে।

—কোনটাই প্রসাদীর বরদাস্ত হবার মতো নয়, বিশেষ করে মনের এই অবস্থায়।

শপথ গ্রহণ আর প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ হলে সহকারী উঠে 'পেঁসনেটা' নামিয়ে মুছে নিয়ে আবার নাকের ওপর বসিয়ে নীচে কাগজটা দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—

"প্রসাদী দাসী, তাই না? বেশ। আমার কথাগুলোর ঠিক ঠিক জবাব পাবো তো?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল প্রসাদী, বলল—"শোন কথা। মিথ্যে কথা বলবার জন্যে শপথ করলুম?"

"ও, তাও তো বটে! মনে ছিল না।"—অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন সহকারী, একটু রহস্যের ভান করে। বললেন—"আচ্ছা, থানায় যা যা বলে এসেছ সেসব তোমার কথাই তো?"

নাও, আবার সেই কথা! বললুম তো…"

এবার কোর্টের দিকেই ঘুরে আরম্ভ করেছে—সহকারী বাধা দিয়ে বললেন—"তাহলে তোমারই কথা। বুঝলাম।…বেশ ভেবে বলো। আর ছোট করে—হ্যাঁ, কিম্বা না।"

"সেই রকম জিজ্ঞেস করলেই হয়।" কোর্টের দিকেই মুখটা ফেরাতে গিয়ে বেঞ্চের দিকে সাধারণভাবে চেয়ে উত্তর করল প্রসাদী। বলল—"আমায় ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলে আমি কেন মহাভারত এনে ফেলতে গেলুম গা?"

বেঞ্চের অনেকে কৌতুকে মাথা দোলালো। মাঝখান থেকে একটা অপ্রত্যাশিত উপভোগের সামগ্রী এসে পড়ায় দর্শকরাও হয়ে উঠেছে কৌতুক-চঞ্চল।

"না তোমার মহাভারত শুনতে আমরা কেউ আসিনি নিশ্চয়।"

সহকারী এবারও একটু রসিকতার ভাব এনে কথাটা হালকা করে

ফেলবার চেষ্টা করলেন। 'পেঁসনেটা' নামিয়ে দোলাতে দোলাতে বললেন—"ঘটনার দিন দারোগাকে যা বলেছ আর রঘু-থাকোমণি ফিরে এলে যা বলেছ দুটোই তো তোমারই কথা ?...হ্যাঁ, কিম্বা না।"

—তর্জনীটা তুলে ধরলেন।

প্রসাদী একটু ব্যাজার হয়েই বিমূঢ় দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল সবার ওপর দিয়ে। বলল—"ভালো এক 'হ্যাঁ-না'র পাল্লায় পড়া গেল তো! আগে যা বলেছি, তারপর ওরা ফিরে আসতে যা বললুম—এক কথায় 'হ্যাঁ-না' বললেই খোলসা হয়ে যাবে ?"

সরকারী উকিলকে উঠতে হল।

সহকারীর গাউনে ইসারায় একটু টান দিয়ে বসিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কতকটা ওঁর মুখ রাখবার জন্যেই কোর্টের দিকে চেয়ে ইংরাজিতে বললেন—

"A very obstinate witness, your honour."

(বড় একগুঁয়ে সাক্ষী, ধর্মবতার)

কোর্ট একটু মৃদু হেসে বললেন—

"So it seems, She must not be scratched the wrong way."

(তাই মনে হয়। ঘাঁটিয়ে তুলে দরকার নেই)

সরকারী উকিল প্রসাদীর দিকে চেয়ে বললেন—"ঘটনার দিন তুমি দারোগার কাছে যে এজাহার দাও, তারপর রঘু থাকোমণি ফিরে এলে যা বল, দুটোর মধ্যে কোনই মিল নেই। এটা কেন হল ?"

"হ্যাঁ না, করেই বলতে হবে ?"

"না, তা কি করে হবে ? যেমন চাও বলো তুমি।"

সরকারী উকিল উঠতেই মুখের ভাবটা নরম হয়ে এসেছিল প্রসাদীর, আরও শান্ত হয়ে এল। একটু চোখ ঘুরিয়ে ভাবতে দেখে উনি প্রশ্ন করলেন—"মনে করিয়ে দিতে হবে ?"

"না নিজেই বলেছি, মনে করিয়ে দিতে হবে কেন ?"—শান্ত কণ্ঠেই বলল প্রসাদী, শুধু একবার সহকারীর দিক থেকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে আনল।

"তাহলে বলো।"

—সরকারী উকিল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

"দারোগাকে আগে যা বলি সেটা বাড়ির মান বাঁচাবার জন্যে।"

"মান বাঁচানোটা কি ?"

"গেরস্তঘরের বউ, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, উঠোনে একটা আমগাছের

ভাল ভেঙে পড়েছে, তার নীচে চাপা পড়েনি, সোতরাং কথা দাঁড়াবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অপবাদের কথা নয় ?"

"তারপর ?" —কোর্টের লেখা শেষ হলে প্রশ্ন করলেন সরকারী উকিল।

"তারপর থাকোমণি সোয়ামীর সঙ্গে ফিরে আসতে যখন দেখলুম সে বেঁচেই রয়েছে, সব শুনে যখন বুঝতে পারলুম কোনও কলঙ্কের কথা নয়, হলে সোয়ামীও তাকে ফিরিয়ে আনত না ঘরে, তখন আদৎ কথাটাই বললুম, বলতে বাধা রইলো না বলেই।"

'বেশ'—বলে সরকারী উকিল একটু চিন্তা করে নিলেন। তারপর বললেন—'আপত্তি না থাকলে সমস্ত ঘটনাটা আবার হুজুরকে একবার শোনাতে পার ?'

কোর্ট ইংরাজিতে বললেন—

"When this episode has no particular relevence to the main issue, why drag it uselessly ?"

(আসল মামলার সঙ্গে এ কাহিনীর যখন বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই, তখন বেশি টেনে নিয়ে যাওয়া কেন ?)

সরকারী উকিল উত্তর করলেন—

'Witness appears to be rather imaginative, your honour. I would like to place before you how far one statement may differ from the other. For, that may chance to throw some fresh light on the csse.'

(সাক্ষী একটু কল্পনাপ্রবণ মনে হচ্ছে, ধর্মাবতার। আমি হুজুরের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই, ওর একটা জবানবন্দী অন্যটার চেয়ে কতটা প্রভেদ হতে পারে। তাতে এই মামলার ওপর হয়তো নতুন আলোকপাত করতে পারে)

কোর্ট একটু মৃদু হেসে বললেন—

'Well please satisfy yourself then, but better not interrupt her too much.

(নিন ধোঁকা মিটিয়ে তাহলে, তবে বেশি বাধা না দেওয়াই ভালো)

সরকারী উকিল প্রসাদীর দিকে চেয়ে বললেন—'যা বলছিলাম—পরে যা বলেছ সেটা আবার বলতে আপত্তি আছে কি ?'

'একেবারেই নয়। সেখানে যখন বানিয়ে বলিনি, তখন এখানে বলতেই বা আপত্তিটা কিসের ?'

এরপর বিশেষ কিছু হল না। প্রসাদীর কাহিনীটা অস্বাভাবিক মনে হলেও এতো স্বাভাবিক যে কৃপাসিন্ধু মোক্তারকে তাতে হাত দিতেই হয়নি একরকম—বেশ সহজ কণ্ঠে সত্যের সহজ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে গেল প্রসাদী—

'দিনটা সকাল থেকেই বাদুলে ছিল। রঘুর ক'দিন থেকেই খবর নেই—সবারই মনটা খুব খারাপ, তার মধ্যে—যেমন হবারই কথা—থাকো যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছে, সেদিন দুর্জ্জোগের দিন বলেই আরও বেশি করেই। বেশ ভয় পেয়েই গেলুম আমি! যে মহালে যায় রঘু সেখানে ভৈরবকে দুবার পাঠানো হয়েছিল। দেখা পায়নি।

চাপা মেয়ে থাকো, ঠিক বুঝতে পারচিনে তবে, এভাবে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লে মেয়েছেলে সবই করতে পারে, আপ্তহত্যে পজ্জন্ত এটা তো বুঝি, চোখে চোখে রেখে যাচ্ছি ওকে। দুর্জ্জোগটা বেড়েই চলেছে ইদিক। খেলে না। জোর করে বসাতে যা খেলে তা না খাওয়াই। দু'জনের ঘরের মাঝ-খানে একটা দরজা খোলাই রেখেছি। একবার উঠে দেখি, খাটটা খালি। লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে দেখি, সেই দুর্জ্জোগে বারান্দায় চুপ করে বসে আছে। টেনে নিয়ে ভিজে জামা কাপড় ছাড়িয়ে শুইয়ে দিলুম।

ক'দিন থেকে আমারও ওপর দিয়ে খুব একটা ধকোল যাচ্ছে। তার ওপর, দুর্জ্জোগ তো নয়, যেন মন্বন্তর-পেল্লয় এসে পড়েছে। বাজের গজ্জন, তার বিরেম নেই। আশেপাশে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। উঠে থাকোর ঘরে গিয়ে দেখলুম সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনটা চঞ্চল, জেগেই রাতটুকু কাটাব ভেবেছিলুম, কিন্তু আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। যখন ছাঁৎ করে ভাঙল ঘুমটা, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি থাকোর বিছানা আবার খালি। তখন জল-ঝড়ের দাপট খানিকটা কমেছে। তবে, যেমন হয়, চিক্কুব হানছে খুব ঘন ঘন। বাইরে লণ্ঠন থাকে না, ঐ বিদ্যুতের ছাড়া ছাড়া আলোতে ভেতর-বার তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। সেই ঝড়ের ওপর আওয়াজ তুলে ডাকলুম। কোথাও থাকোর সাড়াশব্দ নেই। তখন একেবারে উন্মাদের মত হয়ে গেছি আমি। সদর দরজার বাইরেই আটচালায় ভৈরব ঘুমোয়। নেশার অব্যেস আছে। সেদিন বাদল দেখে আরও নেশা করে মড়ার মতন পড়ে আছে। কোনও মতে তুলতে পারলুম না। কি করি? কিছু মাথায় আসছে না। থাকো বাড়িতে কোনখানে নেই। জ্যান্ত কি মরা। এদিকে য্যাতই সময় যাচ্ছে ত্যাতই বিপদ যাচ্ছে বেড়ে।

ক'বারই ঘর-বার করে শেষকালে বেরিয়ে খিড়কি দিয়ে জঙ্গলের দিকে। আমিও তখন পাগলের মতন হয়ে গেছি, তবে এটুকু জ্ঞান আছে, গেরস্তর বৌ, পাগলই হায় যাক, কি যাই হোক, গ্রামের রাস্তা ধরবে না, খিড়কি হয়ে আগাছার জঙ্গলে জঙ্গলে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারপর যা করবার তা করবে। মহালে রঘুর রুদ্দেশ ক'রে যে বেরিয়েছে থাকো তাতে তো আর সন্দো থাকে না।

আমি খিড়কির কলাবাগানের মধ্যে দিয়ে উঠে পড়ে এগুলুম। মাঝে মাঝে নাম ধরে চেঁচাচ্ছি। ও দিকটা এক নিধু মালাকারের আর অন্য দু-একটা ঘর ছাড়া আর বসত নেই। উঠে পড়ে এগুচ্ছি। বিদ্যুতের আলোয় সুমুখ দেখে দেখে। তাতে যেন চোখ ধাঁধিয়েই দিচ্ছে আরও। তারপর গড়-গড়িদের আমবাগান পেরিয়ে মালাকারের উঠোনে পা দোব, ঠিক সেই সময় এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে উঠতে একেবারে আঁৎকে উঠলুম—একটা লাস! —প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলুম 'মা থাকো, বলে একেবারে আছড়ে পড়লুম।

একটু চুপ করল প্রসাদী।

সরকারী উকিল প্রশ্ন করলো—'থামলে যে?'

একটু যেন বিভ্রান্ত হয়েই চোখ ঘুরিয়ে চাইল প্রসাদী। কিসের যেন একটা চেষ্টা। তারপর বলল—"আমি এখানটা ঠিক গুছিয়ে মনে করতে পারছিনে। এরপর একেবারে যা মনে পড়ছে—আমি সেই লাস কাঁধে ফেলে বন-বাদাড় ভেঙে এগুচ্ছি…"

সরকারী উকিল বললেন—"একটা গোটা মানুষের লাস, পারলে তুমি বয়ে আনতে?"

ডায়াসের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন সরকারী উকিল।

প্রসাদী বলে চলল—"কী করে যে পেরেছিলুম আমারই অবাক লাগে। ঘাড়ে যেন একটা ভূত চেপেছে, আনতেই হবে কোনও রকমে। তবু খানিকটে যে ক্ষ্যামতা আছে, ঝোঁকের মাথায় বাড়তেও পারে এটা তো আমায় দেখে মানতেই হবে। কিছু গুমোর করছিনে।"

একবার শরীরটাতে ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিল প্রসাদী, তারপর আবার বলে চলল—'এরপর যা হোল, তাতে তো এমন কিছু দাঁড়ায়ও না যে খুব একটা ভেলকি দেখিয়েছি। বাড়িতে এসে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন জ্বেলে দেখি—থাকো নয়। মালাকার পেশাদার সিঁদেল, কুমতলবে নিজের ভাইঝি বলে পরচে দিয়ে

কোথা থেকে যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল—দুদিন এসেও ছিল আমাদের বাড়ি—সেই মেয়েটা। বয়স এই বছর কুড়ি-বাইশ হবে। ক্ষীণজীবী, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একটু খাটো বলে যেন যোলোসতেরোর বলে মনে হয়—কী যেন নাম বলেছিল, একটু হাল ফাসানের, মনে নেই--সেই মেয়েটা। হালকাই, তাই অতটা মেহনৎ হয় নি।

কয়েক জায়গায় থেঁতলে গেছে, কাঁধের এক জায়গায় যেন বেশি, তা ভিন্ন চোট বাইরে খুব বেশি নেই। মনে হয়, চাল ভেঙে পড়ছে দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে গাছের ডাল ভেঙেই হোক, বা যা করেই হোক, একটা চোরা আঘাত খেয়ে মরে পড়েছিল। আগে ভেবেছিলুম থাকোই দিশেহারা হয়ে যেতে যেতে চাপা পড়ে মারা গেছে।

থাকো নয়, যেখানেই থাকুক, মরেনি তাহলে— এই কথাই যে কেন মনে হোল তা ঠিক বলতে পারব না। তবে, আর তার খোঁজে বেরুতে কেমন যেন তাগিদ পেলুম না মনের দিক থেকে। তা ছাড়া খুব ক্লান্তও হয়ে পড়েছি, মনটাও ঝিমিয়ে পড়েছে। মেয়েটার লাসের সামনে চুপ করে বসে আছি, নানারকম ভাবনা। কখনও মেয়েটার দিকে চেয়ে বসে আছি, তার কথাই এলোমেলো ভাবছি, কখনও থাক্যের কথা মনে পড়ছে--তারপরে হঠাৎ একটা খেয়াল হোল—থাকো গেছে তো জন্মের মতনই গেছে—এ দুর্জোগে ফিরতেও হবে না, কোথাও গিয়ে উঠতেও হবে না, মাঝখান থেকে সামন্তবাড়ির একটা কলঙ্কই তো? এক কাজ করলে কেমন হয়? মেয়েটাকে ঝুলিয়ে যদি রটিয়ে দিই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তো কেমন হয়? আমায় যাতই জেরা করা হোক, আমি সে সময়ের মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারব না। কী যে এলোমেলো অবস্থা যাচ্ছে? তবে, ভালো হোক, মন্দ হোক, একটা যেন কাজ পেলুম, তাইতে আর এক ঝোঁক সেই ভূতে পাওয়া ক্ষ্যামতাটাও।...হাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি—গলায় দড়ির কথাটা আরও এই থেকে মনে পড়ল যে, ঘাড়ের কাছটা থেঁতলে দিয়ে জিভ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে মেয়েটার।

ত্যাখন একেবারেই শেষ রাত। খুব হালকা একটু একটু আলো দেখা দিয়েছে। আমি যোগাড়যন্ত্র করে, দুদিকের দরজাই ভালো করে বন্ধ করে এসে টাঙিয়ে দিলুম মেয়েটাকে। তারপর ভৈরবকে ঠেলে ঠেলে তুললুম। তারপর দারোগাকে যা বলেছি।"

সমস্ত ঘরটায় একটা সূচ পড়লে তার শব্দটা শোনা যায়। প্রসাদী যেন

একটু দম নেওয়া গোছের করে থামল। তারপর সরকারী উকিলের দিকে মুখ করে প্রশ্ন করল—"মিলেছে ?"—একটু ব্যঙ্গের টোনেই।

সরকারী উকিল একটু ফিকে হেসে বললেন—"তা একরম মিলেছে বৈকি।"

—হাসি উঠল একটু।

"আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন, না, নেমে যাব ?"

"না আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই ?"

পাশে তাঁর সরকারী একটু মাথাটা ঘেঁসিয়ে এনে ফিসফিস করে মুখ ঢাকার কথা নিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সরকারী উকিল নীচু গলাতে বললেন—"যাক।"

—বসে পড়লেন।

আসামীপক্ষের উকিল উঠলেন জেরার জন্য।

"দু' মিনিট। তুমি লাসের মুখের ঢাকা খুলতে দাওনি। সব সাক্ষীই বলেছে। খুলতে গেলেই কেঁদে লাসের ওপর আছড়ে পড়ে বলেছ—ভয়ানক দৃশ্য।"

"ভয়ানক দিশ্য তো বটেই, তবে"—

"হ্যাঁ, তবে ? নির্ভয়ে বলো। আমার ওদিকের বন্ধুর যেন খটকা লাগছে—বানিয়ে বলার প্রমাণ খুঁজছেন তো ?"

'ঢাকা খুললে সামন্তবাড়ির মান বাঁচাতে যা করেছি—লুকনোও তো নয়—সেটা টেঁকতো ?'

'আর একটা কথা—আমাদের খটকা লাগে বৈকি। আমার ও তরফের বন্ধু দুজনের তো লাগবেই—একটা গোটা লাস, মানুষ মারা গেলে আরও ভারীই হয়ে যায়, তা তুমি পারলে আনতে একলা কাঁধে করে ?

বলেছি তো সে কথা।' এরপরেই সহকারীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে না প্রেত্যয় হয় তো কেউ মরে দেখুক না।'

এবার হাসিটা সরবই হয়ে উঠল। নেমে এস প্রসাদী।

আসামীপক্ষের সব সাক্ষীই রঘুর দুর্ব্যবহার ও ক্ষীরোদা-ঘটিত ব্যাপার অস্বীকার করল বা সে-সম্বন্ধে অজ্ঞতা জানাল। ইতিপূর্বে সরকারী পক্ষের সাক্ষীও প্রায় সবাই কৃপাসিন্ধুর কি অজ্ঞাত ব্যবস্থায় গোলমাল করে বলায় মামলা দুর্বল হয়েই ছিল, আরও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ল।

থাকোমণি-ঘটিত কাহিনীটা রোমাঞ্চকর হলেও জটিলতাবর্জিত, সুতরাং

তাতে বিশেষ পরিবর্তন দরকার হয়নি কৃপাসিন্ধুর, যা প্রকৃত তারই কাছাকাছি রাখা হয়েছে। এমনভাবে সাজানো হয়েছে কাহিনী যে, তাকে বেশি জেরার সম্মুখীন হতে হল না। যেটুকুই বা হল, সহজভাবেই কাটিয়ে যেতে পারল, এবং সত্যের ছাপ থাকায়, ও যে সত্যই রঘুর স্ত্রী থাকোমণি, যা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে এসেছিল, একেবারেই সন্দেহাতীত হয়ে গেল।

এরপর কোর্ট কাঠগড়ায় আসামী রঘুর দিকে চেয়ে বললেন—'সব শুনলে ; তোমার কিছু বলবার আছে কি ?'

'না ধর্মবতার'—রঘু করজোড়ে বলল। —'আমার যা বলবার লিখেই দোবো। উপস্থিত আমার স্ত্রী তো সামনেই দাঁড়িয়ে।'

এরপর বিধিবিধান সংক্রান্ত বাকি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে সেদিনের মতো এজলাস উঠে গেল।

দিন সাতেক পরে রায় বেরুল—সাক্ষ্য এবং ঘটনাপরম্পরা বিচার করে থাকোমণির যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না কোর্টের। সেক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগও ভিত্তিহীন। সুতরাং আসামী বেকসুর খালাস।

একটি দুর্যোগের রাত্রি থেকে শুরু হয়ে যে মসীঘন করাল ছায়া সামন্তবাড়ীর ওপর এসে পড়েছিল, সেটা সরে গিয়ে একটা নতুনতর আলোয় ধীরে ধীরে জেগে উঠছে সামন্তবাড়ী। সে রঘু নেই। সুতরাং থাকোমণিও আর ঠিক সে থাকোমণি নয়। প্রসাদী অবশ্য সেই প্রসাদীই রয়েছে বাড়ি মহাল সামলে, তবে সুর ধরেছে—'আর কেন? বেচু এসে পড়েছেই—দুই স্যাঙাতে সামলাক—আমায় এবার রেহাই দিক। দুজনে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে তিথ-ধর্ম করে এল—অথচ আমারই তো পাওনা...'

বেচারামকে অবশ্য চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনেছে রঘু, তবু ভয়ই পায়। থাকোমণিকে বলে—'আমার...কি যে বলে...অনব্যেসের ফোঁটা...তুমি পিসিকে বুঝিয়ে বলো ..."

থাকোমণি তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বলে—'বকে যেতে দাও না—যাওয়া কথার কথা কিনা। তোমার অনব্যেসের ফোঁটা, ওর এদিকে পায়ের শেকল, যাক না ছিঁড়ে পারে তো।'